কথিকা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, এম. এ, পি-এচ. ডি.
("ভাস্কর")

১৯৪৯

ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রায় সবগুলি গল্পই পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

কথিকা ১
পরিচয় ২
পরীক্ষা ৯
উপায় ১১
পছন্দ ৩১
ডাক্তার ৪৩
দার্জিলিং ৫৩
প্রয়োজন ৬৮
হাসি ৭৮
বিমলা ৮৩

গ্রন্থকারের অন্য বই

লেখা (সরস প্রবন্ধ ও গল্প) ২৲

শুভশ্রী (গল্পের বই) ১৲

মজলিস (গল্পের বই) ১।০

গণিতের ভিত্তি (সরল ভাষায় বিবৃত গণিতের মূলতত্ত্ব) ॥০

কথিকা

প্রভাতে উঠিয়া দেখি, আমার কুটিরখানি আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। এক ফালি রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে ঘরের দাওয়ার উপরে, মনে হইতেছে যেন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া আছে। উঠানের ঘাসগুলি শিশিরে ভিজিয়া আছে, কে যেন এক রাশ মুক্তা আনিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে। এক পাশে গোয়ালঘরে গরু ও বাছুর দুটি আজ যেন কত সুন্দর দেখাইতেছে। ছোট একটি ঢিবির উপরে তুলসী গাছ তার স্নিগ্ধ স্বাদু হিত পূত পাতাগুলি হইতে একটি অনির্বচনীয় সৌরভ ছড়াইতেছে। রান্নাঘরের পিছনের বাঁশের ঝাড়টিকে মনে হইতেছে, কতদিনের পুরাতন বন্ধু। বৎসরের পর বৎসর কত সুখদুঃখের সাথে এর স্মৃতি বিজড়িত। অন্নপ্রাশনের রন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানের পথে শববাহন পর্যন্ত কত প্রকারের কত কর্মে এরা নিজেকে বলি দিয়াছে! ওই যে লেবু গাছটি, আজ মনে হইতেছে, প্রতিদিন নিজের স্বাদু রসাল নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিতেছে আমাদেরই পরিতৃপ্তির জন্য। উঠানের পাশে ছাইয়ের গাদা; আজ তো তেমন বিশ্রী মনে হইতেছে না। মনে হইতেছে, সংসারের জিনিষের শত প্রকারের মলিনতা ঘষিয়া মাজিয়া ধুইয়া পরিচ্ছন্ন করিবার জন্য নীরবে একপাশে চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। বিড়ালটা কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে—উহার সঙ্গে যেন কত দিনের মধুর পরিচয়। দুধ মাছের উপর উহার অত্যাচারের কথাটা আজ যেন মনেই পড়িতেছে না! দাওয়ার নীচে বসিয়া আছে কুকুরটা; দিনের বেলায় খেলার সাথী, রাত্রে সজাগ প্রহরী। ইচ্ছা হইতেছে, উহাকে লইয়া মাঠে খানিক ছুটিয়া

আসি। শালিক পাখীটারই বা আজ কি হইল! কেবল যেন গানই করিতেছে; অন্যদিন উহার গলা তো মোটেই মিষ্ট লাগে না।

গৃহিণী গৃহকর্মে ব্যাপৃত হইয়াছেন, যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মী; কোনদিন ক্ষণেকের জন্য বিরূপ হইতে পারেন, তাহা আজ কল্পনায়ও আসে না। খুকীর আজ কি হইল! হাসিতেছে, খেলিতেছে, নাচিতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে—কি সুন্দর! হয় তো একটু দুষ্টামিও করিতেছে, কিন্তু তাহাও কত মধুর! ফ্রকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, তা ফেলুক—ছেলেমানুষ বই তো নয়। ওই যে চায়ের পেয়ালাটা হাত হইতে ফেলিয়া ভাঙিয়া ফেলিল—তা কি আর করা যাইবে! ছেলেমানুষের কাজই তো ভাঙাচোরা; আজ আর উহার প্রতি রাগ হইতেছে না। বরং উহার ছেলেমানুষি দেখিয়া মনে মনে আনন্দই হইতেছে।

গোয়ালাটা এখনও আসিল না। গরু দোহান হইতেছে না। দুধ না হইলে চা খাইবার জো নাই। তা কি আর করা যাইবে? গোয়ালাও তো মানুষ, একটু দেরী-টেরি হওয়া আর আশ্চর্য কি! অন্য দিনের মত আজ আর চায়ের দেরীর জন্য মন খারাপ হইয়া উঠিতেছে না। না হয় একটু দেরীই হইবে! খুকী আসিয়া খবর দিল, উঠানের পাশের কুমড়ার বড় ডগাটা পাশের বাড়ীর ছাগলে খাইয়া গিয়াছে। দাঁতন করিতে করিতে বলিলাম, কি আর করা যাবে, ছাগলের মুখ আটকান কঠিন। অন্য দিন হইলে হয় তো এখুনি পাশের বাড়ীর সঙ্গে কোঁদল বাধিয়া যাইত। বড়বাড়ীর সেজ বৌটা এই সকালেই কি ভীষণ চেঁচামিচি আরম্ভ করিয়াছে। কি আর করা যাইবে? বৈচিত্র্যই তো সংসারের বৈশিষ্ট্য, অধৈর্য হইলে চলিবে কেন! বেচারী কি কষ্টই না পাইতেছে! অন্য দিন যাহা দুঃসহ মনে হইতে, আজ তাহা নিতান্ত

সহজ এবং স্বাভাবিক মনে হইতেছে। প্রাতঃকালের গৃহকর্ম সারিয়া গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, একবার মুদীর দোকানে না গেলে তো আর চলে না। এমন সময়ে এ প্রস্তাব শুনিলে অন্যদিন চটিয়া যাইতাম, কিন্তু আজ অতি ধীরে বলিলাম, এই যাই। তুমি ততক্ষণ দুধটা জ্বাল দিয়ে চায়ের চেষ্টা কর। সংসারের অনটন, প্রাতঃকালে গিয়া মুদীর তোষামোদ, কিছুই আজ মনটাকে তিক্ত বা উত্তেজিত করিতে পারিতেছে না।

সমস্ত সংসারটারই যেন আজ রং বদলাইয়া গিয়াছে। একটা শুচিতা, একটা আনন্দ, একটা তৃপ্তি, একটা সন্তোষ যেন মনটাকে ভরিয়া দিয়াছে। ইহার কারণ কি ?

কারণ অতি তুচ্ছ। আমারই আঙিনায় আজ আমারই রোয়া গোলাপ গাছে একটা সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে !

এমনই হয় !

যাহা সুন্দর, যাহা পবিত্র, যাহা মধুর, তাহা এমনি করিয়াই পারিপার্শ্বিকের মন আনন্দে, তৃপ্তিতে, উদারতায় ভরিয়া দেয়।

নভেম্বর, ১৯৪১

পরিচয়

১

কয়দিন হইল নূতন ফ্ল্যাটে আসিয়াছি। ভাড়া কম, আলোবাতাস প্রচুর। সুতরাং খুবই সুবিধা।

দেখি, বারান্দায় আমার মেয়ে টুনি আর একটি মেয়ের সঙ্গে পুতুল-খেলা জুড়িয়া দিয়াছে। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কে ?

গৃহিণী বলিলেন, ওই তো পাশের বাড়ীর মেয়ে পুনি।

এক দিন আপিস হইতে ফিরিয়া টুনিকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, টুনি কোথায় ?

উত্তর আসিল, টুনি গেছে পুনিদের বাড়ী।

সন্ধ্যার সময়ে বারান্দায় গড়াইতেছি। শুনি, ছাদের উপর বিষম দুম্ দাম্ শব্দ হইতেছে। সংবাদ লইয়া জানিলাম, টুনি এবং পুনি জোরসে স্কীপিং করিতেছে।

কিছু দিন পরে।

খাইতে বসিয়াছি। দেখি থালার পাশে রেকাবিতে কয়েকখানি ক্ষীরের পুলি-পিঠে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি ?

উত্তর পাইলাম, পুনির মা পাঠিয়েছে।

আর এক দিন। দেখি একটি কাঁসার বাটি সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, সঙ্গে ঠাকুর।

ব্যাপার কি ?

ব্যাপার আবার কি ! একটু চুষি-পিঠে পাঠিয়ে দিলাম পুনির মাকে।

শনিবার সন্ধ্যা। শরীরটা ভাল লাগিতেছে না। একটু চুপচাপ পড়িয়া আছি। গৃহিণী হঠাৎ ঘরে আসিয়া বলিলেন, ওঠ তো, একটু ওঘরে যাও।

কেন বল তো !

কেন আবার। পুনির মা বেড়াতে এসেছে। যাও, ওঘরে গিয়ে একটু ব'স।

কয়েক দিন পরে। আপিস হইতে ফিরিয়া দেখি, শোবার ঘরের দরজায় তালা। চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাইজি কোথায় ?

চাকর বলিল, মাইজি গেছেন পুনি-খোখীর বাড়ীতে।

কখন আসবেন, বলে গেছেন কিছু ?

সে তো হামি জানি না।

গৃহিণী ফিরিলেন সন্ধ্যার পর। প্রশ্নোত্তরে জানিতে পারিলাম, পুনির কাকীমা আসিয়াছেন দেশ হইতে, তাঁরই সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য টুনির মার ডাক পড়িয়াছিল।

রবিবার একটু দিবানিদ্রার পর উঠিয়া দেখি, টুনি সাজিতেছেন এবং টুনির মা তাহাকে সাজাইতেছেন। রঙীন শাড়ী ঘাঘরার মত করিয়া পরানো হইয়াছে। হাতে, গলায়, মাথায় নানা আকারের ফুলের সাজ।

ব্যাপার কি ?

ব্যাপার আবার কি ? আজ সন্ধ্যার সময়ে টুনি আর পুনি নাচবে —ওই পাশের বাড়ীতে। তাই একটু আগে থেকে—

তা বেশ ! আচ্ছা, ও শাড়ীখানা কোথায় পেলে ? আমি কিনেছি ব'লে তো মনে পড়ে না !

তুমি কবেই বা কি কিনলে? আজকাল মেয়েদের কি লাগে না-লাগে, কিছু খবর রাখ?

স্বীকার করলাম, রাখি না।

তবে চুপ ক'রে থাক। ও শাড়ীখানা পাঠিয়ে দিয়েছে পুনির মা।

সন্ধ্যার পর টুনি নাচিয়া ফিরিয়াছে। গলায় একটা ছোট মেডাল চক চক করিতেছে।

মেডাল কে দিল?

কে আবার দেবে? ওই পুনির কাকীমা দিয়েছে।

এমনি করিয়াই ছয় মাস এই ফ্ল্যাটে কাটিয়া গিযাছে।

২

শনিবার। ডালহৌসি স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে ট্রামে উঠিতেছি। ভীষণ ভীড। একটুও স্থান নাই। অল্প চলন্ত ট্রামেই কোন গতিকে উঠিবার চেষ্টা করিতেই 'ঠকাস, উঃ'—আমার কপালটা ভীষণ জোরে ঠুকিযা গেল এক ভদ্রলোকের টাকের সঙ্গে। কোন মতে দাঁড়াইবার একটু স্থান করিয়া লইয়া বলিলাম, কি রকম ভদ্রলোক মশাই, আপনি? একেবারে চোখ বুজে ছিলেন নাকি?

ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন, আপনিই বা কেমন ভদ্রলোক, ট্রামে উঠবার সময়ে কি চোখ বুজে চলন্ত ট্রামে উঠছিলেন?

পরস্পরের দিকে রোষ এবং বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার পর ভদ্রলোক কোনমতে একটা সীটে স্থান করিয়া লইলেন। আমি নিকটস্থ একটা হাতল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম।

ট্রাম হইতে নামিবার সময়ে দেখি, ভদ্রলোকটিও নামিয়া পড়িলেন। কিছু দূর যাইবার পর দেখি, ভদ্রলোকটিও সঙ্গে আসিতেছেন। যখন

ডান দিকে মোড় ঘুরিলাম, দেখি ভদ্রলোকটিও ডান দিকে ঘুরিলেন। যখন আমি বাঁ দিকে মোড় ঘুরিলাম, তখনও ভদ্রলোক আমারই সঙ্গে বাঁ দিকে ফিরিলেন। ব্যাপার কি? একটু বিরক্ত স্বরেই জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছেন কেন বলুন তো? কিছু বক্তব্য আছে?

ভদ্রলোকটি বলিলেন, আমিও ঠিক সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আপনি কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছেন?

আমি? আমি তো যাচ্ছি আমার বাসায়!

কোথায় আপনার বাসা?

ওই তো, ওই যে লালবাড়ীটা—ওরই দোতলার ফ্ল্যাট—

ওই ফ্ল্যাটে 'টুনি' বলে একটা মেয়ে থাকে না?

হ্যাঁ, টুনি আমারই মেয়ে। তা, আপনি জানলেন কি ক'রে?

আমিও তো থাকি এখানেই—ওই সাদা বাড়ীটায়।

ওখানে 'পুনি' বলে একটা মেয়ে থাকে না?

হ্যাঁ, পুনি আমারই মেয়ে।

বটে! আপনিই অশোকবাবু—হেঁ, হেঁ—নমস্কার!

আপনিই তাহলে প্রকাশবাবু—হেঁ, হেঁ—নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি খুশি হলুম।

৩

আপিসের পোষাক ছাড়িতেছি। গৃহিণীকে বলিলাম, আজ পুনির বাবার সঙ্গে আলাপ হ'ল। খাসা লোক।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তুমি যে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পার, তা তো আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার যত ফটর ফটর কেবল কাগজে কলমে।

কপালে হাত দিয়া দেখি, একটা জায়গা ফুলিয়া আস্ত সুপারির মত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে।

অক্টোবর, ১৯৪১

পরীক্ষা

আমার পিস্‌তুত শ্বশুরের ভাইয়ের ছোট শালার মেজ ছেলেটি পল্লীগ্রাম হইতে চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সে কোন মেসে বা হোটেলে উঠিতে পারিত, কিন্তু একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কলিকাতায় থাকিতে অন্যত্র গিয়া উঠিলে, পাছে আমি অসন্তুষ্ট হই, এই আশঙ্কায় সে আমার বাসাতেই উঠিয়াছে। ইতিপূর্বে সে কখনও কলিকাতায় আসে নাই, সুতরাং কয়েকদিন সঙ্গে করিয়া লইয়া কিরূপে বাসে উঠিতে হয়, কিরূপে রাস্তা পার হইতে হয়, ইত্যাদি শিক্ষা দিবার পর একখানা অল্‌-সেক্‌শন মাসিক টিকিট কিনিয়া দিলাম। সে উহা লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া চাকুরির সন্ধান করিতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করিলাম, তাহার মাফঃস্বলিক জড়তা দূর হইয়াছে এবং বেশ স্মার্ট হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার পথঘাট প্রভৃতি কেমন চিনিয়াছে, তাহা একটু পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একদিন তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করি। তাহাতে যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্র। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ হইতে হাওড়ার পুল পর্যন্ত—ঐ অঞ্চলকে কি বলে?

উ। মাড়োয়ার-নগর।

প্র। লালবাজার হইতে চৌরঙ্গী পর্যন্ত—এ স্থানটাকে কি বলে?

উ। চুচাংগঞ্জ।

প্র। ধর্ম্মতলা হইতে এলগিন রোড পর্যন্ত?

উ। লণ্ডনতলা।

প্র। এল্‌গিন রোড হইতে কালিঘাট পর্যন্ত ?

উ। এর খানিকটা আয়ারপটি এবং বাকিটা খালসাপুর।

প্র। কালিঘাট হইতে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত যে প্রশস্ত পথ গিয়াছে, উহার নাম কি ?

উ। পার ভেন্থু অ্যাভেনিউ।

প্র। ওখান হইতে যে ছোট গলিটা লেকের দিকে গিয়াছে, উহার নাম ?

উ। স্বব লেন।

প্র। আচ্ছা, ও অঞ্চলটা কর্পোরেশনের কোন ওয়ার্ডে, বলিতে পার ?

উ। হাঁ, ওটা মর্গেজ ওয়ার্ড।

প্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঝোঁক কোন দিকে বেশি ?

উ। নিমতলা ঘাট স্ট্রীট এবং কেওড়াতলা ঘাট রোড।

উত্তর শুনিয়া মনে হইল, আত্মীয়টি ফুল মার্কস্‌ পাইবার উপযুক্ত।

অক্টোবর, ১৯৩৪

উপায়

বেকার ভজহরি এখনও বেকার।

সারাদিন টো টো করিয়া, সন্ধ্যার পর ছাদে পায়চারি করিয়া, নরহরির ফ্রেণ্ড-রূপে মেসের ডাল-ভাত গিলিয়া, রাস্তার মোড় হইতে এক পয়সার মিঠে পান চিবাইয়া ঘরে ফিরিয়াছে। নরহরি লুঙি পরিয়া খাটের উপর বসিয়া বিড়ি খাইতেছে। নরহরি বলিল, কি খবর, কিছু সুবিধে টুবিধে—

কিছু না ব্রাদার, কিছু না। আমি ঠিক ক'রেছি—

কি ঠিক ক'রেছ?

ঠিক ক'রেছি, সুইসাইড ক'রব।

তাতে আর লাভ কি?

সুইসাইড কি আর কেউ লাভের জন্য করে? সত্যি, ঘেন্না ধরে গেছে। কত ব্যাটার কাছে গেলাম, দেখাই করে না। কার্ড ফিরিয়ে দেয়। কারো ভাগ্‌নে কিংবা সম্বন্ধী না হ'তে পারলে আর কোন আশা নেই। কিন্তু সে তো আর আমার হাতে নয়!

তোমার হাতে যা আছে তা তো হ'তে পার?

কি হ'তে পারি?

জামাই।

আমাকে যিনি জামাই ক'রবেন, তিনি কি দরের লোক হবেন, তা তো বুঝতেই পারছ। তাছাড়া মেয়েকে চৌকাঠ পার করিয়ে দেবার পরক্ষণেই প্রায় সব শ্বশুরই সম্বন্ধ বদলে ফেলেন!

তুই একটা অতি ইয়ে! সেইজন্যই তোর কিছু জোটে না। সে যাক গে। আমি যা বলি তাই কর। একটা বিধবার মেয়ে বিয়ে কর, শ্বশুরের ইয়ে সইতে হবে না।

তোর ফাজলামোটা বন্ধ কর দেখি। ইয়ার্কিরও একটা সময় অসময় আছে। তোর তিন সপ্তার ফ্রেণ্ডস্ চার্জ বাকি পড়েছে, খেয়াল আছে?

দেখ, ফাজলামি করছি নে। যে যুগের যা। আজকাল ব্যাচিলারের চেয়ে বিবাহিতেরই চান্স্ সব দিকে বেশি। একটা বেশ চটুলা, চতুরা, চঞ্চলা, চপলা, ইংরেজি-জানা মেয়ে বিয়ে করে ফ্যাল—দেখিস কপাল ফিরে যাবে।

স্ত্রীভাগ্যে ধন কি আর সকলের জোটে!

জোটে রে জোটে। রোস, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলেছে।

দুই বন্ধুতে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ হইল। তারপর নরহরি এবং ভজহরি পাশাপাশি দুইখানি নড়বড়ে খাটে শুইয়া পড়িল।

২

পরদিন। মেসে সম্প্রতি একটি নূতন চাকর আসিয়াছে। ফর্সা রঙ, ছিপছিপে গড়ন, বয়স কম। গোঁফ উঠি উঠি করিতেছে, কিন্তু এখনও ওঠে নাই। লেখাপড়া জানে। তাহাকে ডাকিয়া নরহরি বলিল, কেষ্ট! তুই এর আগে কোথায় ছিলি?

সে কথা আর কেন জিজ্ঞেস করেন? ছিলুম এক যাত্রার দলে, সখী সাজতুম, কুড়ি টাকা মাইনে পেতুম। দুই অংশীদারে মিলে ঝগড়া করে দল দিলে ভেঙে। দায়ে পড়ে এখন আমার এই অবস্থা, নইলে—

শোন, তোকে আবার সখী সাজতে হবে। পঁচিশ টাকা মাইনে পাবি।

কোন দলে বাবু? আমি তাহলে আজই কাজে লেগে যাই। দেখবেন, কেমন নাচি?

এই বলিয়া কেষ্ট নরহরির ঘরে ভজহরির সম্মুখে কোমর দোলাইয়া হাত ঘুরাইয়া মডার্ন ঢঙে একটু নাচিয়া ফেলিল।

নরহরি বলিল, থাক, আপাতত তোকে নাচতে হবে না। এখন থেকে মাস তিনেক তোকে আমার ফ্রেণ্ড ভজহরির স্ত্রী সেজে থাকতে হবে। ও যখন যেখানে থাকবে, সেখানে থাকবি; ও যা বলবে তাই করবি। বুঝলি?

যে আজ্ঞে! মাইনেটা কিন্তু সময়মত চাই।

সে হবে। কোন ভাবনা নেই।

কেষ্ট আপাতত মেসের কাজে গেল। পাশের ঘরের বাবু কচুরি আর বিড়ির অপেক্ষায় অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন। কেষ্ট দোকানে ছুটিল। পরদিন হইতে সে নূতন চাকরিতে বহাল হইবে।

ভজহরি বলিল, এত সব খরচপত্র। কাপড় চোপড়, জুতো, গয়না, হোটেলের খরচ—

তোর কোন ভাবনা নেই। তিনমাসের সব খরচ আমি দেব। আমার পাশ বইতে কিছু আছে। চাকরি পেলে পরে আমার টাকা দশ পার্সেণ্ট সুদ সমেত ফিরিয়ে দিস। এটা আমার একটা ইন্‌ভেস্টমেণ্ট, বুঝলি?

কিন্তু যদি সবই বৃথা হয়?

এ প্ল্যান কখনই ব্যর্থ হবে না। নে, সব জোগাড় টোগাড় ক'রে তৈরি হয়ে নে।

৩

ভজহরি সস্ত্রীক অর্থাৎ সকেষ্ট 'আদর্শ হোটেলে' আসিয়া উঠিয়াছে। ছোট একটা সাজানো ঘর। কোন অসুবিধা নাই। খাওয়া-দাওয়া ঘরেই হয়। স্টেট্‌স্‌ম্যান ও অমৃতবাজার রাখা হইয়াছে। প্রত্যহ সকালে 'ওয়ান্‌টেড'গুলি ভাল করিয়া দেখিয়া, যেগুলি কাজে লাগিবার সম্ভাবনা সেগুলিকে কাঁচি দিয়া কাটিয়া রাখা হয়। একখানা কম্‌বাইণ্ড ভিজিটিং কার্ডও ছাপান হইয়াছে। কার্ডখানি এইরূপ:

প্রতিদিন আহারাদির পর দুইজনে উপরোক্ত কাটিংগুলি এবং কয়েকখানা ভিজিটিং কার্ড লইয়া বাহির হন এবং যেখানে যেখানে সাক্ষাৎ করা দরকার, সেখানে সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। কাজ হউক বা না হউক, ভজহরি দেখিতেছে যে এখন আর সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে কোন অসুবিধা নাই। নরহরির প্ল্যান যে একটু কার্যকরী হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

একদিন হোটেলের ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা রোজই দুপুরে বেরোন দেখছি। কোথায় যান বলুন তো?

ভজহরি বলিল, আর বলেন কেন মশাই! স্ত্রীর হয়েছে

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি থেকে আরম্ভ করে কত কি করলুম, কিছুতেই কিছু হয় না। রোজ এক একজন নূতন ডাক্তার দেখাচ্ছি। ফতুর হয়ে গেলাম মশাই!

আহা, তাইতো! এইটুকু বয়সে—

গেরো মশাই, গেরো! নইলে কি আর—

ম্যানেজার আর কিছু বলে না। এমন রোগী তার হোটেলে প্রায়ই আসে। এই সব রোগীর পয়েই তো হোটেল এই কয় বৎসরেই এমন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।

৪

মিসলেনিয়াস ওয়ার্কার্স লিমিটেড। ম্যানেজার মিঃ তরুণকান্তি ব্যানার্জি। দুইপাশে ফাইলের গাদা, পিছনে ফাইল-হাতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, উপরে ঘূর্ণ্যমান পাখা। বেলা সাড়ে এগারটা। বেয়ারা একখানা কার্ড আনিয়া দিল—বলা বাহুল্য, ভজহরির কম্বাইণ্ড্‌ কার্ড। কার্ডখানি হাতে করিয়াই মিঃ ব্যানার্জি সহকারীকে বলিলেন, একটু পরে আসবেন। বেয়ারাকে বলিলেন, সেলাম দেও।

সস্ত্রীক ভজহরি ভিতরে আসিয়া পাশাপাশি দুইখানা চেয়ারে বসিল। নমস্কার-পর্ব শেষ করিয়া ভজহরি একটি কাটিং মিঃ ব্যানার্জির হাতে দিল। মিঃ ব্যানার্জি বলিলেন, কাজ একটা আছে বটে, তবে সেটা মিসেস্‌ সরখেলেরই উপযুক্ত কাজ। মানে, সর্টিং অফ লেটার্স। এই ঘরেই বসে উনি কাজ করবেন। কোন অসুবিধে হবে না। সর্টিংটাই অফিসের সবচেয়ে দরকারী কাজ, বুঝলেন কি না। দরকারী চিঠিগুলো ঠিক মত সর্ট করে অফিসের সবাইকে পৌঁছে দেওয়া দরকার। এসব বেয়ারাদের দিয়ে ওকাজ চলে না। তা বেশ, কাল থেকেই উনি

আসবেন। দশটায় অফিস খোলে, সাড়ে দশটার মধ্যেই আসা চাই। আচ্ছা, নমস্কার!

ভজহরি সস্ত্রীক হোটেলে ফিরিল। কেষ্ট বলিল, এ কি হ'ল? অপনি যে একেবারে চুপ ক'রে রইলেন সেখানে?

ব্যাপারটা এমনই হঠাৎ হলো যে আমি কি বলব বা কি বলব না, তা ঠিকই ক'রতে পারলুম না। ম্যানেজারটাকে চটাতেও সাহস হ'ল না। দেখি, নরহরি কি বলে।

সন্ধ্যার পর স্ত্রীকে হোটেলে রাখিয়া ভজহরি নরহরির মেসে গিয়া তাহাকে বলিল, তোমার বুদ্ধিটা যে অতিবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়াল।

ব্যাপার কি?

এযে উল্টা বুঝিলি রাম!

মানে?

মানে কেষ্টর চাকরি হ'য়ে গেল।

নরহরি সবিশেষ শুনিল। তারপর দুইজনে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিবার পর ভজহরি হোটেলে ফিরিল। কেষ্ট বলিল, এখন উপায়?

উপায় হবে। ঘাবড়াও কেন?

আমার সঙ্গে কিন্তু তিনমাসের চুক্তি। এর মধ্যে যা হয় করুন।

তিনমাস না হয়, ছ'মাস হবে। তোর তো দেখছি, পোয়া বারো। ডবল মাইনে আর বসে বসে পাখার বাতাস খাওয়া।

যাই হোক, যা ক'রবেন শিগ্‌গির করে ফেলুন। বেশি দিন কিন্তু আমি এসব পারব না।

বেশিদিন করতে হবে না।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর ভজহরি সস্ত্রীক আহারে বসিল।

পরদিন এ হোটেল ছাড়িয়া আদর্শ-নিবাসে গিয়া উঠিল।

৫

মিসলেনিয়াস্ ওয়ার্কার্স লিমিটেড্। তরুণবাবুর অফিস। বেলা পাঁচটা। ফাইল-বগলে অ্যাসিষ্টাণ্টদের দল ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। দিনের কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। ঘরের একপাশে টেবিলের উপর বাঁ হাতের কনুই রাখিয়া এবং হাতের উপর মাথা রাখিয়া মিসেস সরখেল চোখ মিট মিট করিতেছেন।

তরুণবাবু একটু বিরক্তির সুরেই বলিলেন—ওঃ, ফাইল আর ফাইল! আমাকে আপনারা মেরে ফেলবেন দেখছি। আপনাদের সব হ'ল কি? যেখানকার যত পুরাণো কেস, সব একসঙ্গে করে সবাই এসে জ্বালাতন আরম্ভ করেছেন। আফিসটা কি পালিয়ে যাচ্ছে, না ফাইলগুলো পাখা মেলে উড়ে যাবে? এত তাড়া কিসের? আজ আর না। আমি এখুনি বেরুবো। দরকারী এনগেজমেণ্ট আছে। যাচ্ছি একটা ক্যাপিট্যালিস্টের কাছে। লাখ-খানেক টাকার শেয়ার গতাতে হবে।

একজন অ্যাসিস্টাণ্ট নিম্নস্বরে বলিলেন, মোটে লাখ-খানেক!

অ্যাসিস্টাণ্টগণ আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইলেন। তরুণবাবু বলিলেন, মিসেস্ সরখেল!

বলুন।

আপনি কি এখুনি বাড়ী যাবেন?

অপিসই যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি আর বসে থেকে কি করব? চিঠি সর্ট করা তো হ'য়ে গেছে বারটায়। বসে বসে তো আমার পায়ে খিল ধরে গেল।

আমিও তো যাচ্ছি আপনাদের ওদিকেই। চলুন না আমার গাড়ীতেই—

আমি তো ট্রামেই গিয়ে থাকি।

আচ্ছা, আজ চলুন আমার সঙ্গে।

মিসেস্ সরখেল নিরুত্তর। মৌনং সম্মতিলক্ষণং। তরুণবাবু বলিলেন, আচ্ছা আপনি তাহলে আগে যান, আমার গাড়ী তো চেনেন—বসুন গিয়ে। আমি আস্‌ছি।

গাড়ীতে বসিয়া তরুণবাবু বলিলেন, উঃ কি গরম! একটু গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক। আউটরাম ঘাটের নিকট গিয়া তরুণবাবু বলিলেন—আসুন, এক কাপ চা—

না থাক্।

না, সে হবে না। চলুন, আপিসের এই হাড়-ভাঙা খাটুনির পর একটু—। চিঠি সর্ট করা কি যা তা কাজ—অফিসের সব কাজের চেয়ে দরকারী কাজ হচ্ছে ওইটি। সমস্ত বিজ্‌নেসটাই তো চলছে চিঠির উপরে।

মৌন সম্মতির সহিত মিসেস সরখেল তরুণবাবুর সঙ্গে গিয়া চায়ের টেবিলের পাশে বসিলেন। তরুণবাবুর বাড়ীর পাশের বাড়ীর একটি ছেলে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আউটরাম ঘাটে বেড়াইতে আসিয়াছে। ছেলেটি তরুণবাবুকে দূর হইতে একটা নমস্কার করিয়া সরিয়া গেল। তরুণবাবু চা-পান শেষ করিয়া জলের ধারে একটু পায়চারি করিয়া মোটরে উঠিলেন।

তরুণবাবু বলিলেন—এ জায়গাটা বেশ, না?

হুঁ।

এখনই বাড়ী যাবেন?

কোথায় যেতে চান?

মেট্রোয় যাবেন? একটা ভাল ছবি আছে আপনার স্বামী কিছু মনে ক'রবেন না ত?

এতে আর মনে ক'রবার কি আছে ?

মেট্রোর প্রশস্ত বারান্দার পাশে গাড়ী থামিল। তরুণবাবু এবং মিসেস্ সরখেল গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিট ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকানের দিক হইতে তরুণবাবুর পিসতুত শ্যালিকা রমা ব্যাগ হাতে হন্ হন্ করিয়া উহাদের সামনে দিয়াই চলিয়া গেলেন। তরুণবাবুর সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল, ক্ষণিকের জন্য। সম্ভবত সঙ্গে অপরিচিতা মহিলা দেখিয়াই রমা দেবী কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া সোজা ধর্মতলার দিকে অগ্রসর হইলেন !

সিনেমা দেখা শেষ হইলে তরুণবাবু বলিলেন—চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

না, থাক, আমি ট্রামেই যাব।

কেন, গাড়ী যখন রয়েছে, কতক্ষণ আর লাগবে ?

বিশেষ ধন্যবাদ। আমি ট্রামেই যাব। আপনাকে আর ট্রাবল দেবো না। নমস্কার !

নমস্কার !

শ্রীমতী কেষ্ট আদর্শনিবাসে ফিরিলেন। ভজহরি বলিল, এত দেরি যে !

মেট্রোয় গিয়েছিলুম।

বেড়ে আফিস।

৬

তরুণবাবুর বাড়ী। তরুণবাবু যখন মেট্রোতে ঢুকিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁর সহধর্মিণী সুরমাদেবী রেডিওর চাবি খুলিয়া গান শুনিতে-

ছিলেন। একটু পরে আউটরামঘাট-প্রত্যাগত প্রতিবেশী ছোকরার ভগিনী সুলেখা আসিয়া বলিল, মাসিমা, আপনি যে বড় বাড়ীতে বসে?

কেন?

মেসোমশায় তো বেড়াতে গেছেন গঙ্গার ধারে!

যাঃ, আজকাল ওঁর কাজ কত বেড়ে গেছে। তাই ফিরতে দেরী হয়। বোস এখানে, গান শোন।

তা শুন্‌ছি। কিন্তু দাদা যে ব'ল্‌লে সে একটু আগে দেখে এসেছে, মেসোমশাই আর—, ইয়ে—, মেসোমশাই গঙ্গার ধারে চা খাচ্ছেন আর বেড়াচ্ছেন।

তা হ'তেও পারে। হয় তো আপিসের পর একটু—

হ্যাঁ, তা তো ঠিক। দাদা ব'ল্‌লে, মানে—, দাদা ব'ললে—

দাদা কি ব'ললে?

ব'ললে, মানে—ইয়ে—

কি ব'ললে, বল্ না।

ব'ললে, মানে, মেশোমশাই গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলেন আর চা খাচ্ছিলেন।

এই কথা বলিয়াই সুলেখা উঠিয়া পলাইয়া গেল।

সুরমাদেবী রেডিওর চাবি বন্ধ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বোধ হয় সুলেখার কথার সুর ও ভঙ্গীর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহাতে সুরমা যেন একটু অস্বস্তি বোধ না করিয়া পারিলেন না। উঠিয়া গিয়া কিছুক্ষণ গোটা কয়েক নিরর্থক কাজ করিয়া ফেলিলেন। দম দেওয়া ঘড়িতে পুনরায় দম দিলেন। পরিষ্কার আয়নাখানি আবার মুছিলেন। ফাইলে গোঁজা পুরোনো চিঠি ও ক্যাসমেমো পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঝিটাকে ডাকিয়া অনর্থক একবার বকিয়া দিলেন। আবার ফিরিয়া আসিয়া রেডিওর চাবি খুলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

একটু পরেই সিঁড়িতে খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল। পর মুহূর্তেই সম্মুখে উপস্থিত পিস্‌তুত বোন রমা। সুরমাদেবীর প্রায় সমবয়সী।

সুরমাদেবী বলিলেন, হঠাৎ কি মনে করে?

এই যাচ্ছিলাম এই পথে। ভাবলুম একবার তোর এখানে ঢুঁ মেরে যাই।

তা বেশ করেছিস। বোস, একটু চা ক'রতে বলি।

না, না। চা তো আমি বেশি খাই নে। তা ছাড়া, এই একটু আগেই খেয়েছি। এখন আর কিছু খাব না।

তবে, গান শোন।

তুই যে বড় বাড়ীতে ব'সে ব'সে গান শুনছিস্? জামাইবাবুকে তো দেখে এলাম, মেট্রোয় ঢুকতে।

সুরমাদেবীর মুখ হইতে আপনি বাহির হইয়া গেল, মেট্রোয়?

হ্যাঁ, আশ্চর্য হলি যেন!

না, না। আজকাল ওঁর আপিসের কাজ ভয়ানক বেড়ে গেছে কি না। তাই হয় তো, আপিসের পর একটু—

আমি তো দূর থেকে ভাবলুম, তুইও সঙ্গে রয়েছিস। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলুম—

কি দেখলি?

দেখলুম, মানে—, দেখলুম তুই যাস নি। তবে—

তবে কি?

সঙ্গে আর একজনকে দেখলুম।

কাকে?

আমি চিনি নে।

বোধ হয় আপিসের কোন বন্ধু টন্ধু হবে।

বোধ হয়। আচ্ছা, আমি আজ আসি। তুই তো আর আমাদের ওদিকে মাড়াস নে। যাস একদিন।

যাবো।

রমা চলিয়া গেল। রমার কথাগুলির স্বর এবং ভঙ্গীও স্বরমাদেবীর পছন্দ হইল না। বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। একবার ভাবিলেন, তরুণবাবু ফিরিলেই একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্থির করিলেন, না এইরূপ সামান্য অছিলায় একটা 'সীন' করা সমীচীন হইবে না। এখন সম্পূর্ণ নীরব ও নিশ্চিন্ত থাকিবেন। স্বামীকে তাহার মনের সন্দেহ কিছুতেই জানিতে দিবেন না। আরো কিছুদিন দেখিয়া পরে যাহা হয় করা যাইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া স্বরমাদেবী নিজেকে সংযত করিলেন এবং মনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরাইয়া আনিলেন।

৭

মিঃ ব্যানার্জি বাড়ী ফিরিয়াছেন। স্বরমাদেবী অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলেন, তোমার আজকাল বড় দেরি হয় আপিস থেকে আসতে।

হ্যাঁ, কাজ ভয়ানক বেড়ে গেছে। ওয়ারের জন্য জার্মেনি, ইতালি প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সব বন্ধ। যত অর্ডার, তার বেশির ভাগই এসে পড়ছে আমাদের মিস্‌লেনিয়াসে।

তোমাদের ব্যবসা কিসের গো?

মিসলেনিয়াস. মানে—নানারকম।

ও। যাই বল, আজ তোমার বড দেরি হ'য়ে গেছে। এত দেরি ক'রো না, শরীর খারাপ হবে।

কি করি বল? আমাদের কাজ বেড়ে চলেছে ব'লে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপিটালও বাড়াতে হচ্ছে কি না! আজই বিকেলে এক মাড়োয়ারীকে আড়াই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রী করা হ'ল। সেই সব কাগজপত্র ঠিক করতে করতে—

এত খাটুনির পর একটু বিশ্রামও তো দরকার। আপিসের পর বরঞ্চ একটু যদি গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে তার পর বাড়ী ফের তো মন্দ হয় না।

তরুণবাবু স্বগত বলিয়া ফেলিলেন, গঙ্গার ধারে! বলে কি!—পরে গৃহিণীকে বলিলেন, হ্যাঁ, তা মন্দ হয় না। তবে কি জান, আপিসের ছুটী হ'লেই বাড়ীতে এসে পৌছানর জন্য মনটা ছট্‌ফট্‌ ক'রে ওঠে।

তা করুক। তাই ব'লে তো শরীরটা মাটি করা যায় না। এত খাটুনি, তার পর একটু বিশ্রাম না ক'রলে চলবে কেন? বরঞ্চ এক আধ দিন আপিসের কাউকে সঙ্গে ক'রে একটু সিনেমা দেখে এসো। তোমার কাজের যে ভীষণ চাপ পড়েছে, তাতে সময়মত বাড়ী ফিরে আমাকে নিয়ে বেরোনো—সে তো এখন হ'য়ে উঠ্‌বে না—

তরুণবাবু মনে মনে বলিলেন, ব্যাপার কি? গঙ্গার ধার, সিনেমা—। প্রকাশ্যে বলিলেন, হ্যাঁ—তা মন্দ কি? তবে কি না, তুমি সঙ্গে না গেলে আমার ছবি দেখাই হয় না।

তাই নাকি গো! আমার জন্য বুঝি ফুল এনেছ? পকেটে বুঝি? কেমন সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে!

ফুল! পকেটে! গন্ধ বেরুচ্ছে! মানে, ভুল ট্রামে লেডিজ সীটে বসে পড়েছিলাম কি না—। কিংবা বোধ হয়—মানে, ওই যে

মাড়োয়ারিটা সাড়ে চার লাখ টাকার শেয়ার কিনলে, তাকে একটা পার্টি দেওয়া হ'ল কি না—সেখানে আতর, গোলাপ জল, কত কি—বোধ হয়—

নাও, হয়েছে! এখন কাপড়চোপড় ছেড়ে খাবে চল। রাত হয়েছে।

৮

কিছুদিন পরে। মিসলেনিয়াস ওয়ার্কার্স আপিস। মিঃ ব্যানার্জির ঘর। তরুণবাবু ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, শ্রীমতী তাঁহার পূর্বেই আসিয়া স্বস্থানে বসিয়াছেন। টুপি এবং ছড়ি যথাস্থানে রাখিয়া তরুণবাবু নিজ চেয়ারে বসিয়া লক্ষ্য করিলেন, শ্রীমতী কাঁদিতেছেন। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া রুমাল বাহির করিয়া শ্রীমতীর চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিছনের দিকে সুইংডোর খুলিয়া কয়েকজন অ্যাসিষ্টাণ্ট এবং কেরাণি তরুণবাবুর অলক্ষ্যে নানাবিধ নীরব মুখভঙ্গী করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী দেখিয়াও দেখিলেন না।

তরুণবাবু বলিলেন, কি হয়েছে আপনার? কাঁদছেন কেন?

শ্রীমতী আরও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তরুণবাবু রুমাল দিয়া ক্রমাগত চোখ মুছাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দৈবাৎ একবার পিছনের দিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, কোথা গেল দরওয়ানটা। এই বেয়ারা—

বেয়ারা আসিয়া উপস্থিত হইল। তরুণবাবু চটিয়া বলিলেন, তুমলোক কেয়া করতা হ্যায়? টেবিল পর সিগারেটকা ছাই সাফা নেহি করতা হ্যায়, আর ওহি ছাই উড়কে উড়কে মেমসাহেবকা আঁখমে চলা যাতা হ্যায়—

এই কথা বলিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে তরুণবাবু নিজ চেয়ারে বসিলেন এবং অ্যাসিস্ট্যাণ্টদিগকে বলিলেন—দেখুন, কনফিডেন্-সিয়াল ফাইলটা—এটা এখানে রেখে যান। এই ফাইলটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা কেউ এঘরে আসবেন না। আমার এটা শেষ করতে প্রায় ঘণ্টা দুই লাগবে।

অ্যাসিস্ট্যাণ্টগণ চলিয়া গেলন।

তরুণবাবু শ্রীমতীকে ডাকিয়া বলিলেন, এখানে আসুন। হ্যাঁ, বসুন। এবার বলুন, আপনার কি হয়েছে।

আপনাকে বলে লাভ কি ?

তবু, বলুন না।

আমাদের বাড়ীওয়ালা আজ ইজেক্টমেণ্টের নোটিশ দিয়েছে। আমাদের দাঁড়াবার স্থান নেই।

কেন, আপনার স্বামী ত—

তিনি আজ তিন বছর বেকার। ওঁর একটা চাকরি না হ'লে আমাদের মান মর্যাদা দূরে থাক, কলকাতায় দুবেলা দুটো—

আচ্ছা, আমি দেখছি, কি ক'রতে পারি।

যদি দয়া করে আপনার আপিসেই একটা কাজ দেন—

দেখুন, সেটা আমার খুব পছন্দ নয়। মানে, একই আপিসে স্বামী-স্ত্রী। ওতে কাজের ক্ষতি হবে। বরঞ্চ দেখছি, আমার জানা একটা ফার্মে ঢুকিয়ে দিতে পারি কি না।

দয়া ক'রে একটু বিশেষ চেষ্টা ক'রবেন কিন্তু।

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

তা'হলে এখন যাই, চিঠি সর্ট করি গে।

আচ্ছা—যান।

৯

ভজহরির চাকরি হইয়াছে। আদর্শ-নিবাস ছাড়িয়া উহারা সুরুচি-আশ্রমে উঠিয়া আসিয়াছে। ধরা পড়িবার ভয়ে এক হোটেলে বেশিদিন থাকিতে উহাদের সাহস হয় না।

রবিবার। আপিস নাই। আহারাদির পর কেষ্ট বলিল, আর কেন, এইবার আমাকে ছেড়ে দিন। শেষে কি জেলে যাব? আর দুদিন আদর্শ-নিবাসে থাকলেই ধরা পড়ে যেতাম। ওখানকার ম্যানেজারের শ্যালকটি যেভাবে আমার পিছু নিয়েছিল—

আর কটা দিন একটু ধৈর্য্য ধরে থাক। আমার প্রোবেশনারি পিরিয়ডটা উৎরে যাক। কি জানি বাপু, এর মধ্যে আবার কি ক'রে বসে।

প্রোবেশনারি পিরিয়ডও শেষ হইল। ভজহরির বেকারত্ব সত্যই ঘুচিল! কম হউক, বেশি হউক, মাস অন্তর কিছু তো আসে। আর নরহরির ফ্রেণ্ড হইতে হইবে না। ফ্রেণ্ডস্ চার্জের জন্য আর নরহরিকে মেসের ম্যানেজারের তাড়া খাইতে হইবে না। রাত্রে খাইবার পরে একটা মিঠে পানের অভাব হইবে না।

ভজহরি কেষ্টকে রেহাই দিল। কেষ্ট আর আপিস গেল না।

তরুণবাবু একদিন ভজহরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভজহরি অতি ভারাক্রান্ত বিষণ্নমুখে আপিস-ঘরে প্রবেশ করিল। তরুণবাবু বলিলেন, আপনার স্ত্রী আজ কয়দিন আসেন নি। অসুখ বিসুখ করে নি তো! কোন খবরও তো দিলেন না।

ভজহরি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তরুণবাবু শশব্যস্তে বলিলেন, ব্যাপার কি?

ভজহরি কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, আমার সর্বনাশ হয়েছে, সার।

সে সর্বনাশী আমার সর্বনাশ ক'রে গেছে। উঃ কি ভীষণ কলেরা—একেবারে এশিয়াটিক কলেরা, সার্।

তরুণবাবু সান্তনা দিয়া বলিলেন, যা হবার হ'য়ে গেছে। কেঁদে আর কি করবেন। নিয়তিকে কেউ বাধা দিতে পারে না।

ভজহরি কাঁদিতে কাঁদিতেই বাহির হইয়া গেল।

১০

মুস্কিল হইল কেষ্টকে লইয়া। ভজহরি স্বীয় মেসে নরহরির ঘরে সীট লইয়াছে। কেষ্ট একে তো যাত্রাদলের সখী। তারপর গত কয়েক মাস যাবৎ ইলেক্‌ট্রিক পাখার বাতাস, মোটরে ভ্রমণ, হোটেলে খাওয়া, সিনেমা দেখা এবং অন্যান্য নানাবিধ আদর যত্নে খাঁটি থিয়েটার-বাবুতে পরিণত হইযাছে। এখন তাহার পক্ষে আর মেসের ত্রিশজন মেম্বারের খাটুনি খাটা সম্ভম নয়। অথচ একটা কিছু চাই তো! ভজহরিরও একটা মর‍্যাল রেস্‌পন্সিবিলিটি আছে। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কেষ্টকে বলিল, ভদ্রলোকের বাড়ীতে কাজ করবি? ছোট পরিবার, বেশি ঝামেলা নেই।

কেষ্ট অগত্যা বলিল, আচ্ছা।

পরদিন আপিস যাইবার সময়ে একটু দেরি করিয়াই মেস হইতে বাহির হইল। কেষ্টকে সঙ্গে লইয়া তরুণবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইল। তরুণবাবু তখন আফিসে চলিয়া গিয়াছেন। কয়েকদিন পূর্বে তরুণবাবু ভজহরিকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার চাকরটা দেশে চলিয়া গিয়াছে। যদি তাঁহার জানা বা তাঁহার কোন বন্ধুর জানা ভাল চাকর থাকে, তাহা হইলে যেন তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দেন। ভজহরি তাই কেষ্টকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তরুণবাবুর ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, বাবু আমাকে

একটা চাকরের কথা বলেছিলেন। এই লোক দিয়ে গেলাম। মাইজিকে ব'লো এ কাজকর্মে খুব ভাল।

ঠাকুর মাইজিকে সংবাদ দিল। চাকর অভাবে বাড়ীতে খুবই অসুবিধা হইতেছিল। মাইজি বলিলেন, ওকে ব'লো—এখন থেকেই থাকতে।

কেষ্ট কাজে ভর্তি হইল।

যাত্রার দলে এবং ব্যবসায়-অফিসে যে সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ে অভ্যস্ত, গৃহস্থ-ঘরের বিশ্বস্ত চাকরের অভিনয় তাহার পক্ষে খুবই সহজ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেষ্টর কাজকর্ম চালচলন দেখিয়া সুরমাদেবী মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

তরুণবাবুর আপিসের কাজ আজকাল কমিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ ঠিক পাঁচটায় বাড়ী ফেরেন।

আজও ফিরিয়াছেন। সুরমাদেবী বলিলেন, একটা চাকর-রত্ন পেয়েছি।

কলকাতার চাকর-রত্ন। তোমার ধনরত্নগুলো সাবধান।

সে ভয় নেই। চেনা লোক। ভজহরিবাবু দিয়ে গেছেন। কাজকর্ম কি নিখুঁত, আর কি পরিষ্কার! মনেই হয় না যে চাকর!

কই, ডাক তো দেখি তোমার রত্নটাকে—

কাপড় চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও। ও আসছে চা আর খাবার নিয়ে।

তরুণবাবু প্রস্তুত হইলে সুরমাদেবী ডাকিলেন, কেষ্ট!

আজ্ঞে!

চা আর খাবার নিয়ে আয়।

যাই মা।

কেষ্ট চা এবং খাবার লইয়া তরুণবাবুর সম্মুখে আসিয়াই হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। চায়ের বাটি এবং

খাবারের থালা মাটিতে পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই কেষ্ট ছুটিয়া সেখান হইতে পলাইল।

এদিকে তরুণবাবু কেষ্টকে দেখিয়াই 'ওঃ' বলিয়া চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িলেন। একটু পরে ঠাকুরকে ডাকিয়া ধরাধরি করিয়া সুরমা দেবী তাঁহাকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তরুণবাবু প্রকৃতিস্থ হইয়া সুরমাদেবীকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সুরমাদেবী বলিলেন, এই ধরণের একটা কিছু আমি অনেক আগেই সন্দেহ ক'রেছিলাম। কিন্তু তোমাকে আমি ভাল ক'রেই চিনি, তাই কিছু বলিনি। আমি জানি, বেশি কোন অন্যায় তুমি ক'রতে পার না।

তরুণবাবু আবার বলিলেন, আমায় ক্ষমা কর।

সুরমাদেবী বলিলেন, যাও, তুমি ভারি ছেলেমানুষ!

তরুণবাবু বলিলেন, ওই ভজহরিটা কি রাস্কেল! ওকে আমি জেলে দেবো।

থাক। আর বীরত্বে কাজ নেই। তাছাড়া, বেচারী—পেটের দায়ে—কি আর এমন অন্যায় ক'রেছে?

যা করবার তা তো করেছে! তার পর আবার কেষ্টকে আমাদেরই বাড়িতে পাঠানোর মানে?

আর কোনো মানে থাক বা না থাক, এতে তোমার আর আমার দুজনেরই মনের অস্বস্তিটা যে কেটে গেল, এটা কি কম লাভ?

এই কথা বলিবার পর সুরমাদেবী কেষ্টকে ডাকিলেন; কেষ্ট সভয়ে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং গলবস্ত্র হইয়া মিস্টার ব্যানার্জি এবং সুরমাদেবীকে প্রণাম করিল।

মে, ১৯৪১

পছন্দ

মিঃ ব্যানার্জি কুমার, অর্থাৎ চিরকুমার। অনেকে মুখে বলে, বিবাহ করিব না, কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা থাকে। মিঃ ব্যানার্জি সেরূপ কুমার নহেন। সত্যই বিবাহ করিবেন না। ইঁহার বিবাহ না করিবার কারণ শুধু সেন্টিমেণ্টাল নয়, সুদৃঢ় সোশিও-ইকনমিক যুক্তি এবং থিওরির উপর ইঁহার আপত্তি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু হইলে কি হয়! পরিচিত অপরিচিতেরা কেহই মিঃ ব্যানার্জির কথা বিশ্বাস করে না। কেহ বলে, মনের মত মেয়ের অভাবেই বিবাহ করিতেছেন না; কেহ বলে, কোর্টশিপের সুযোগ মিলিতেছে না; আবার কেহ বলে, যুতসই দাঁও জুটিতেছে না; আবার কেহ বলে, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন বৈলাতিক ব্যাপার আছে।

ক্রমাগত বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। পথে, ট্রামে, বাসে, অফিসে, কলেজ স্কোয়ারে, গড়ের মাঠে, সর্বত্রই, কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই ঐ এক কথা, বিয়ে কর্‌ছেন না কেন? একটা বেশ ভাল পাত্রী আছে, ঠিক আপনার উপযুক্ত, ইত্যাদি। মিঃ ব্যানার্জি এক প্রকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। সর্বদা, সর্বত্র, প্রায় একই প্রস্তাব, একই তর্ক, একই আলোচনা—কাঁহাতক ভাল লাগে? তাছাড়া সময় নষ্ট। অনেক সময় পরিচয় বা বন্ধুত্বের খাতিরে কাজ ফেলিয়াও তর্ক করিতে হয়।

মিঃ ব্যানার্জি একটা উপায় স্থির করিলেন। কাহাকেও আর 'না' বলিবেন না। পাত্রীর বিবরণ শুনিয়াই তাহার একটা খুঁত ধরিয়া প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দিবেন। কেহ বিবাহের প্রস্তাব তুলিলেই, মিঃ ব্যানার্জি

বলেন, 'হ্যাঁ তা বেশ তো। এখন তো আমি খুব ব্যস্ত, সামনের মাসের প্রথম রবিবার সকালে আসবেন। সব শুনবো।' সকলকেই ঠিক একই কথা বলেন। ফলে প্রতি মাসের প্রথম রবিবারের একটা সকাল বিবাহ-সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্কে কাটে। যিনি যে প্রস্তাবই করেন, মিঃ ব্যানার্জি এমন একটা খুঁত বাহির করিয়া বসেন, যে প্রস্তাবককে আপনিই চুপ করিয়া যাইতে হয়। কোন প্রস্তাবই অগ্রসর হয় না। আশি মন তেল পোড়ে না রাধাও নাচে না। মাসের একটা সকাল নষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাকী দিনগুলা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটে। তাছাড়া বিবাহের ইচ্ছা না থাকিলেও, মাসে দু এক ঘণ্টা বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা নেহাত মন্দ লাগে না।

এমনই একটা রবিবার। মিঃ ব্যানার্জির ড্রইংরুমে কয়েকজন অ্যামেচার এবং প্রফেশন্যাল ঘটক উপস্থিত। মিঃ ব্যানার্জি বয়কে ডাকিয়া সকলের জন্যই এক কাপ করিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। পকেট হইতে সিগারেটের টিন বাহির করিয়া, যাঁহারা সিগারেট খান, তাঁহাদিগকে এক একটি সিগারেট দিলেন। তারপর, এক এক জন করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন।

ঘ ১। এই যে, মিঃ ব্যানার্জি, সেদিন যে মেয়েটার কথা বলছিলাম। এই তার ফটো।

মিঃ ব্যানার্জি। (ফটো দেখিয়া) নাকটা তো দেখছি, বেশ থাঁদা। থাঁদা-নাক মেয়ে চলবে না।

ঘ ১। আজ্ঞে ফটোতে কি আর ঠিক চেহারা ধরা যায় ? আপনি একদিন বরঞ্চ মেয়েটিকে দেখেই আসুন।

মিঃ। কিছু দরকার নেই ! ফটো দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে !

ঘ ১। আজ্ঞে, তাহলে—

·মিঃ। আপনি তাহলে আসুন—

ঘ ১। আচ্ছা, আর একটি মেয়ের সন্ধান আছে, তবে তার ফটো আমার কাছে নেই। তারা থাকে পাটনায়—

মিঃ। আচ্ছা, সামনের মাসে আসবেন।

ঘ ১। আচ্ছা, নমস্কার! (নিষ্ক্রান্ত)

ঘ ২। (ফটো দেখাইয়া) এ মেয়েটিকে আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। দেখুন, কি চমৎকার টিকোলো নাক!

মিঃ। কিন্তু ঠোঁট দুটো বড্‌ড পুরু!

ঘ ২। না সার, ফটোতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমি তো স্বচক্ষে দেখেছি। খাসা ঠোঁট দুটো—ঠিক যেন কমলালেবুর দুটো কোয়া।

মিঃ। যাই বলুন, অত পুরু ঠোঁট আমার পছন্দ নয়!

ঘ ২। তাহলে—

মিঃ। তাহলে আমি সরি, আপনার প্রস্তাবটা আমাকে রিজেক্ট ক'রতে হ'ল।

ঘ ২। আচ্ছা, আর একটি মেয়ের ফটো দেখাচ্ছি।

মিঃ। আজ আর না। সামনের মাসে আসবেন। এঁরা সব রয়েছেন। এঁদের সঙ্গেও তো আলাপ করতে হবে!

ঘ ২। আচ্ছা, তাহলে নমস্কার। সামনের মাসে আসব। (নিষ্ক্রান্ত)

ঘ ৩। আচ্ছা সার, দেখুন তো এই ফটোখানা কি চমৎকার! আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।

মিঃ। (ফটো দেখিয়া) দেখ্‌তে তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে। কিন্তু বয়স?

ঘ ৩। বয়স একুশ বছর। ওর বাড়ীর লোকে বলে কম, কিন্তু সার, আমি আপনার কাছে কোন কথা লুকোবো না। শেষে আমাকে দুষবেন। এই অঘ্রাণে একুশে পা দিয়েছে।

মিঃ। আপনার আক্কেলটা কি শুনি ?

ঘ ৩। কেন, সার ?

মিঃ। আপনি কি ব'লে একটা একুশ বছরের খুকীর সম্বন্ধ আনলেন। আমার বয়স সাতাশ, জানেন ?

ঘ ৩। বলছেন কি সার! একুশ বছরের খুকী ? আপনার সঙ্গে তো মোটে ছ' বছরের তফাৎ!

মিঃ। বয়সের অত তফাৎ হ'লে মনের মিল হয় না।

ঘ ৩। অবাক করলেন আপনি! আমার স্ত্রী তো আমার চেয়ে আঠারো বছরের ছোট। আজ বিশ বছর ঘর করছি—চুল সাদা হয়ে গেল—কই কোন দিন তো—

মিঃ। এক সঙ্গে ঘর করলেই মনের মিল প্রমাণ হয় না। মনের মিল যদি থাকে, তাহলে একজন গ্রীণল্যাণ্ড্ আর একজন অষ্ট্রেলিয়ায় থাকলেও কোন ক্ষতি হয় না।

ঘ ৩। কি জানি সার! আপনাদের মত অত বিদ্যে বুদ্ধি তো আমাদের নেই। আমরা সেকেলে লোক! তাহলে—

মিঃ। আসুন। নমস্কার!

ঘ ৩। আচ্ছা, আর একটি মেয়ে আছে, বয়স বোধ হয় আপনারই মত হবে।

মিঃ। এ মাসে আর না। যদি কিছু বলতে চান তো সামনের মাসে আসবেন।

ঘ ৩। আচ্ছা নমস্কার! (নিষ্ক্রান্ত)

ঘ ৪। দেখুন, এ মেয়েটিকে আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হ'বে। বয়স সাতাশ।

মিঃ। ওজন ?

ঘ ৪। এক মন তের সের।

মিঃ। তাহলে তো হ'ল না। আমার ওজন এক মন পঁচিশ সের।

ঘ ৪। সার, ওজনের তফাতে কি আসে যায় ?

মিঃ। যার ওজন কম, তার মনে একটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স—শরীরের ওজন এবং বল সম্বন্ধে—থেকে যায়। যেখানে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, সেখানে ভালবাসা হ'তে পারে না। ভয়, বা বড় জোর—ভক্তি, হলেও হ'তে পারে, ভালবাসা হয় না। সুতরাং—

ঘ ৪। কিন্তু মেয়েদের বেশি মোটা হওয়া কি ভাল ? পাতলা-সাতলা গড়নই তো সবাই পছন্দ করে। আজকালকার ফ্যাশানই তো শ্লিমিং।

মিঃ। আমি তা মানিনে।

ঘ ৪। আচ্ছা, শ্যামবাজারে আর একটি মেয়ে আছে, বেশ মোটা সোটা। দেখ্‌বেন তাকে ?

মিঃ। এ মাসে আর না। যদি আপনার আর কোন প্রস্তাব থাকে তো সামনের মাসে আসবেন।

ঘ ৪। আচ্ছা, নমস্কার ! (নিষ্ক্রান্ত)

ঘ ৫। দেখুন সার, আমার সম্বন্ধটা আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। মেয়েটি বেশ মোটা-সোটা, বয়সও হয়েছে আর এম. এ. পাশ।

মিঃ। এ তো হ'তে পারে না।

ঘ ৫। কেন সার ?

মিঃ। আমি বি. এ। আমার স্ত্রী এম. এ. হ'তে পারে না।

ঘ ৫। তাতে দোষ কি ? মেয়েটি খুব শান্ত আর বিনয়ী—এম. এ. ব'লে একটুও দেমাক নেই। আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন।

মিঃ। আলাপ ক'রে লাভ নেই। এ রকম বিয়ে হ'তে পারে না।

ঘ ৫। কেন, সার ?

মিঃ। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের এডুকেশন ঠিক এক স্ট্যাণ্ডার্ডের না হ'লে খাঁটি প্রেম জন্মে না।

পরের মাসের প্রথম রবিবার। ঘটকবৃন্দ ড্রইংরুমে সমবেত হইয়াছেন। মিঃ ব্যানার্জি আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া সকলকে নমস্কার জানাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

পূর্বের মত এবারেও ঘটকগণ এক-এক করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিতে লাগিলেন এবং মিঃ ব্যানার্জি নানাপ্রকার আপত্তি ও তর্ক দ্বারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। অপর সকলেই চলিয়া যাইবার পর শেষ ঘটক মহাশয় বলিলেন. আপনি বড় ফ্যাস্টিডিয়াস !

তা যাই বলুন, সকলেরই একটা নিজস্ব মত থাকা আমি স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয় মনে করি।

নিশ্চয়ই ! গড্ডালিকাপ্রবাহ আমিও পছন্দ করি না।

ঠিক বলেছেন। বিয়ে ব্যাপারটাকে কখনও লাইটলি নেওয়া উচিত নয়।

আজ্ঞে না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ নয়, ডাক্তার-রোগীর সম্বন্ধ নয়, অনুগ্রাহক-অনুগৃহীতের সম্বন্ধ নয়, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নয়, উত্তমর্ণ-অধমর্ণের সম্বন্ধ নয়, সবল-দুর্বলের সম্বন্ধ নয়—

নিশ্চয়ই না। আমি এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

যাক, তবু আপনি যে আমার মনোভাব কতকটা বুঝতে পেরেছেন, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

কতকটা নয়, সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছি। আমার বয়স তো কম হয় নি। এর মধ্যে নিজে তিনবার বিয়ে করেছি, আর বিয়ে দিয়েছি এক শ বাইশ জোড়া বর-কনের।

সেইজন্যই আপনি আমার মনের ভাবটা বুঝতে পেরেছেন। মোট কথা, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা একটা সমান-সমানের সম্বন্ধ, ছোট-বড়র সম্বন্ধ নয়। সব ঠিক সমান না হ'লে, দুজনের মধ্যে ভালবাসা হ'তে পারে না।

আজ্ঞে না।

এই যে চারিদিকে যত সব দেখছেন, সব এক একটা মিস্‌ফিট। কেউ কারো সঙ্গে মানায় নি। কারো সঙ্গে কারো সত্যিকার ভাব নেই। প্রত্যেকটি বিষয়ে দুজনে সমান না হ'লে এমনি মিস্‌ফিট হ'তে বাধ্য। সেইজন্য আমি এ সম্বন্ধে খুবই সতর্ক।

ঠিকই বলেছেন। ছেলেবেলায় জ্যামিতিতে পড়েছেন—মনে আছে তো—ইকোয়াল ইন অল রেস্‌পেক্টস্—স্বামী-স্ত্রীরও ঠিক তাই হওয়া চাই।

এ সব বিষয়ে রাশ্যায় ভারি সুবিধে। খরচপত্রের দায়িত্ব নেই, ছেলেমেয়ের ঝামেলা নেই, যখন ইচ্ছে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করলেই হ'ল, আবার যখন ইচ্ছে ছেড়ে দিলেই হ'ল।

তাই তো, কি চমৎকার ব্যবস্থা! বয়সও নেই, তারপর আবার বোমা-ফোমার ভয়, নইলে একবার দেখে আসতাম গিয়ে, সে দেশের কমরেড আর কমরেডনীরা কি স্বর্গ রচনা ক'রেছে!

সে যাক, আপনার কি কোন প্রস্তাব আছে? বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, আমাকে উঠতে হবে।

হ্যাঁ, অনেক কষ্টে একটি কনের সন্ধান পেয়েছি। সব বিষয়েই আপনার ঠিক সমান। একটুও ছোটও নয়, বড়ও নয়।

তাই নাকি? বয়স কত?

সাতাশ বছর তিন মাস ছয় দিন—আজকার বয়স।

ওজন?

এক মন পঁচিশ সের সাত ছটাক।

লেখাপড়া?

বি. এ।

উপার্জন?

মাসে পাঁচশ কুড়ি টাকা।

কেমন ক'রে?

ওঁর বাবার আর কেউ নেই। কাজেই ওঁর বাবার আয়ই ওঁর আয়।

ও। দেখ্‌তে কেমন? ফটো আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই দেখুন।

দেখতেও তো মন্দ নয়।

তাহলে আপনি রাজি?

অবশ্য বিয়ে করতে আমি কোন দিনই রাজি নই। তবে আমার একটু আশ্চর্য বোধ হচ্ছে—

কেন বলুন তো?

ঠিক এক বয়স, এক বিদ্যা, এক ওজন, এক আয়—অদ্ভুত কইনসিডেন্স।

অদ্ভুতই তো আপনি চান। আপনি তো গড্ডালিকাপ্রবাহে যোগ দেবেন না।

আপনার খবর ঠিক তো?

নিশ্চয়ই, আপনি ভেরিফাই ক'রে নেবেন!

দেখুন, আমার একটা ভয়ানক কৌতূহল হচ্ছে। বিয়ের ইচ্ছে আমার আগেও ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু একটা সায়েণ্টিফিক এক্সপেরিমেণ্ট করবার বড়ই লোভ হচ্ছে। এমন 'ইকোয়াল ইন অল রেস্‌পেক্‌ট্‌স্‌' বিয়ের ফল কিরূপ দাঁড়ায়, সেটা জগতের কাছে দেখিয়ে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি নে। বিয়ের ইচ্ছে অবশ্য আমার নেই। কিন্তু—

নিশ্চয়ই, সায়েণ্টিফিক এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের খাতিরে লোকে প্রাণ দেয়! আপনি সামান্য একটা বিয়ে করবেন—

আচ্ছা, ভেবে দেখি।

আচ্ছা, নমস্কার!

ঘটক প্রস্থান করিলেন। মিঃ ব্যানার্জি ভাবিতে লাগিলেন।

এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করাই স্থির হইল। কনে দেখা হইল। কোষ্ঠী হইতে বয়স স্থির করা হইল। ইউনিভারসিটির ক্যালেণ্ডার হইতে বি. এ. পরীক্ষার ফল দেখিয়া লওয়া হইল। বেড়ানোর ছলে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়া ওজনটা ভেরিফাই করা গেল। কনের পিতার আয় কত তাহাও সবিশেষ জানা গেল। মোট কথা, ঘটক মহাশয়ের সব কথাই অতি সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইল। সুতরাং মিঃ ব্যানার্জির এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের পথে আর কোন বাধা রহিল না।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল।

নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, হৈ হৈ রৈ রৈ, ইত্যাদি সবই হইল, তবে মিঃ ব্যানার্জি এ সব ব্যাপারে একেবারেই গা মাখলেন না। কারণ তিনি তো আর অন্য পাঁচ জনের মত খালি বিবাহই করিতেছেন না— করিতেছেন এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট। তাই তাঁহার মন সর্বদা ব্যস্ত রহিল,

তাঁহাদের এই সর্বতোভাবে সমান-সমানতার ফল লক্ষ্য করিতে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত থাকিলে এক্স্‌পেরিমেণ্টের ব্যাঘাত হয়, তাঁহাদের অনন্যসাধারণ ভালবাসার জন্ম ও বৃদ্ধি ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায় না। তাই মিঃ ব্যানার্জি স্থির করিলেন, বিবাহের পর এক বৎসর কলিকাতার বাহিরে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে কাটাইবেন।

এই প্ল্যান অনুসারে ব্যানার্জি-দম্পতী এক বৎসর পুরী, ওয়ালটেয়ার, রাঁচি, দার্জিলিং, প্রভৃতি ঘুরিয়া তাঁহাদের বিবাহের বাৎসরিক দিনে কলিকাতায় ফিরিলেন। মিঃ ব্যানার্জি পত্নীকে উপহার দিলেন একটি রিস্ট-ওয়াচ—দাম একশ সত্তর টাকা। পত্নী স্বামীকে উপহার দিলেন একটি ফাউনণ্টেন পেন—দাম বত্রিশ টাকা। উহার ক্লিপে একখানি হীরা বসাইয়া দাম একশ সত্তর টাকা করিয়া লওয়া হইল। কারণ উহাঁরা ইকোয়াল ইন অল রেসপেক্‌ট্‌স্‌, সুতরাং উহাঁদের প্রীতি-উপহারও সমমূল্য না হইলে চলিবে কেন?

বিবাহের প্রথম বাৎসরিক দিন। উভয়েরই মন সুপ্রসন্ন। সন্ধ্যার পর উহাঁরা নিরিবিলি বসিয়া একটু গল্প করিতেছেন। একটা বৎসর যেন একটি দিনের মত কাটিয়া গিয়াছে। আদর্শ প্রেমে মুগ্ধ আদর্শ দম্পতী আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন।

স্ত্রী বলিলেন, আমরা পরস্পরকে যেমন ভালবাসি, সবাই সবাইকে অমনি ভালবাসে?

তা কখনো হতে পারে? আমাদের মত ইকোয়াল ইন অল রেসপেক্‌ট্‌স্‌ তো সবাই নয়!

কিন্তু, ধর, যদি অসুখ হয়ে আমি কুৎসিত হয়ে যাই?

অসুখই বা হবে কেন, কুৎসিতই বা হবে কেন? আর যদি হওই,

তাতে কি আসে যায়? আমাদের প্রেম একেবারে অ্যাবসোলিউট—কোন কিছুর পরই নির্ভর করে না।

ধর, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই?

মিথ্যাবাদী কেন হতে যাবে? আর যদি হওই, তাতেই বা কি আসে যায়?

যদি জোচ্চোর হই?

কি যে বল, তার ঠিক নেই। আজকার দিনে ওসব কি কথা! আমি তো বললুম, আমাদের ভালবাসাটা তো আর যার তার ভালবাসা নয়, এটা সমান-সমানের ভালবাসা। কিছুতেই এর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। যাক্‌গে। তোমার ওসব বাজে ঠাট্টা তামাসা এখন রাখ।

নেহাত বাজে ঠাট্টা নয়। মানে, আমার বয়স এখন কুড়ি; মানে, বিয়ের সময়ে ঊনিশ ছিল—সাতাশ নয়।

তাই নাকি? আমারও কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু কোষ্ঠী দেখে আর সন্দেহ করি কি করে?

ও কোষ্ঠী আমার নয়। সুতরাং বয়সে কিন্তু আমরা সমান-সমান নই।

তা—তা—নাই বা হ'ল।

তাহলে ভালবাসা?

ভালবাসা তো হয়েই গেছে।

একেবারে অ্যাবসোলিউট?

হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই।

আর, ইয়ে, আমি কিন্তু বি. এ পাশ করিনি—চার নম্বরের জন্য ফেল করেছিলাম।

তাতে কি আর হয়েছে? কিন্তু ক্যালেণ্ডারের নাম—

বয়সেই যখন আট বছরের গোলমাল, তখন আর ক্যালেণ্ডার—

তা তো বটেই!

আচ্ছা, চার নম্বরের জন্য কোন রকম মিস্‌ফিট হয় নি তো?

কি যে বল, তার ঠিক নেই।

মানে, ঠিক সমান-সমান তো হ'ল না কি না!

তাতে আর কি?

আর দেখ, আমার ওজন কিন্তু এক মণ পঁচিশ সের নয়।

আমারও কিন্তু অনেক সময় সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু মার্কেটের সে ওজনটা তো ঠিক?

হ্যাঁ। কিন্তু আমার ব্লাউজের মধ্যে দশ সের তিন ছটাক বাটখারা ছিল।

ব্লাউজের মধ্যে বাটখারা! বল কি?

হ্যাঁ, নইলে যে ওজন সমান হয় না! তুমি নিশ্চয়ই রাগ করছ।

না, না, রাগ ক'রব কেন?

আমি হালকা বলে। মানে মিস্‌ফিট—

যাও! কি যে বল? বরঞ্চ—

আর দেখ, আজ চিঠি পেলুম, আমার একটি ভাই হয়েছে। সুতরাং আমার আয় একেবারে শূন্য।

তা—তাতে আর হয়েছে কি?

মানে, আমি একেবারে তোমার গলগ্রহ—সুতরাং ভালবাসা—

যাও! বলেইছি তো, আমাদের ভালবাসাটা একেবারে অ্যাবসোলিউট—

কিন্তু আমি তো কোন বিষয়েই তোমার সমান নই। এমন অসমানে-অসমানে ভালবাসা কি সম্ভব?

তা—মানে—অসম্ভব তো মনে হচ্ছে না।

মানে, মিসফিট্—

চুলোয় যাক গে তোমার মিসফিট্, আর তোমার ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স, আর তোমার ইকনমিক্ ডিপেণ্ডেন্স—যাও, ওঠ, চট্ করে এক-কাপ চা করে নিয়ে এস তো!

জুন, ১৯৪১

—

ডাক্তার

১

মিঃ সরকার জবরদস্ত আই. সি. এস.। বিপত্নীক।

মায়া আর অজিত—চার বছরের ছোট বড়। পিতারই মত সরল, নির্ভীক, তেজস্বী, চঞ্চল, উদার, সদানন্দ, লোকপ্রিয়। আদর করিয়া এবং শাসন করিয়া মিঃ সরকার সন্তান দুইটিকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়া পরম প্রেমাস্পদ পত্নীর দুঃসহ বিরহ ভুলিতে চেষ্টা করিতেছেন।

সেবার এলাহাবাদে ছিলেন। কুক্ষণে একটা জরুরি কন্‌ফারেন্সে যোগদান কবিতে বম্বে গেলেন। কুক্ষণে সেখান হইতে এরোপ্লেনে যাত্রা করিলেন এবং কুক্ষণে সেই এরোপ্লেনখানি বামরৌলি বিমান ঘাঁটিতে নামিবার সময়ে নোজ-ডাইভ করিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

মহাসমারোহে মিঃ সরকারের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। মায়া ও অজিত জগৎ অন্ধকার দেখিল।

লাইফ-ইন্সিওরেন্সের টাকাগুলি হস্তগত হইবার পর জগতের অন্ধকারের ভিতর একটু আলো দেখা গেল। টাকাটা অজিতেরই প্রাপ্য। কিন্তু অজিত মায়াকে প্রাণের মত ভালবাসে। ভাগটা সমান সমানই হইল।

দাদা বলিলেন, আমি আর এলাহাবাদে থাকব না। বি. এস-সি.-টা হ'ল, এখন বিলেত গিয়ে ডাক্তারি পড়ব। বোন বলিল, আমিও

এলাহাবাদে থাকব না। ম্যাট্রিকটা তো হ'ল, এখন কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়ব।

পরস্পরের ছাড়াছাড়ির সম্ভাবনায় উভয়েই কাতর হইয়া পড়িল। মায়া বলিল, কখনও যে তোমায় ছেড়ে থাকি নি। অজিত বলিল, তা আমিই কি থেকেছি? কিন্তু ভবিষ্যৎ তো দেখতে হবে।

মায়া ও অজিত কলিকাতায় আসিল। মায়া কলেজে ভর্তি হইয়া হস্টেলে গিয়া উঠিল। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউণ্ট খোলা হইল। অজিত টমাস কুকে অ্যাকাউণ্ট খুলিয়া লণ্ডন যাত্রা করিল।

প্রতি সপ্তাহে মায়া অজিতকে, এবং অজিত মায়াকে পত্র লেখে।

কিছুদিন পরে দুই সপ্তাহ অন্তর পত্র-বিনিময় হইতে লাগিল। আরও কিছুদিন পরে মাসে একবার। তারপর ক্রমশ দেখা গেল, মায়ার দুই-খানা পত্রের উত্তরে অজিতের পত্র আসে একখানা। তারপর তিন-খানার উত্তরে একখানা, চারখানার উত্তরে একখানা, এমনই করিয়া কমিতে কমিতে অজিতের পত্র বন্ধ হইয়া গেল। অগত্যা মায়াও পত্র লেখা বন্ধ করিল।

পরীক্ষা পাস করিতে করিতে এবং ফেল করিতে করিতে লণ্ডনে অজিতের কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। এদিকে পাস করিতে করিতে এবং ফেল করিতে করিতে মায়ারও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

২

হস্টেলে মায়ার অনেক বন্ধু। তার মধ্যে ছায়াই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখা গিয়াছে, মায়া ও ছায়া প্রায় এক বৎসরেই পাস করিয়াছে এবং এক বৎসরেই ফেল করিয়াছে। এক আধ বার হয়তো ব্যতিক্রম হইয়াছে।

উহাদের বন্ধুত্ব এত গাঢ় যে, দুইজনেই মেয়ে না হইলে, উহাকে প্রায় দাম্পত্য প্রেম বলা যাইত। তাহারা একসঙ্গে খাইত, একসঙ্গে শুইত, একসঙ্গে পড়িত, একসঙ্গে খেলিত, একসঙ্গে হস্টেলের বাহিরে যাইত, একসঙ্গে ফিরিয়া আসিত।

মায়ার আত্মীয়-স্বজন বেশি কেহ কলিকাতায় নাই। যাঁহারা আছেন, তাঁহারা অতি দূরসম্পর্কীয়, খোঁজ-খবর বড় একটা নেন না। ছায়ার আত্মীয়-স্বজন অনেক, অনেকেই খোঁজ খবর লইতে আসেন।

ছায়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মায়া ক্রমশ ছায়ার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিল। ছায়ার আত্মীয়েরা মায়ারও আত্মীয় হইয়া উঠিলেন, ছায়ার বন্ধু-বান্ধবীরা মায়ারও বন্ধু-বান্ধবী হইয়া উঠিলেন।

ছায়ার দাদা, মায়ার দাদা; ছায়ার মাসীমা, মায়ার মাসীমা; ছায়ার 'বেলফুল', মায়ার 'জুঁইফুল'; ছায়ার রমেশদা, মায়ারও রমেশদা; ছায়ার কাকীমা, মায়ারও কাকীমা; ছায়ার মহীনদা, মায়ারও মহীনদা।

ছায়ার যখন ভাল লাগে না, তখন মায়ারও ভাল লাগে না; ছায়ার যখন মাথা ধরে, মায়ারও প্রায় মাথা ধরে। ছায়া যখন ভিজিটিং-রুমে রমেশদার সঙ্গে আলাপ করে, তখন মায়াও রমেশদার সঙ্গে গল্প করে। ছায়া মহীনদার সঙ্গে পিক্‌নিকে যায়, মায়াও মহীনদার সঙ্গে পিক্‌নিকে যায়। ভাইফোঁটার জন্য যখন ছায়ার ডাক পড়ে মানিকতলার মাসীমার বাড়িতে, তখন মায়ারও ডাক পড়ে ছায়ার মাসীমার বাড়িতে। ছায়া যখন যায় ন-বউদির সাধের নিমন্ত্রণ খাইতে, তখন মায়াও যায় ছায়ার সঙ্গে। এমনই করিয়াই মায়া ও ছায়ার সরল স্বচ্ছন্দ জীবন কায়া ও ছায়ার মতই একসঙ্গে চলিতেছিল।

৩

কয়েক দিন হইতে মায়ার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মায়া ও ছায়া উভয়েই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। ছায়া মহীনদাকে পত্র লিখিল, কোন উত্তর আসিল না। অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, মহীনদা লোটা কম্বল সম্বল করিয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে কাহারও সাক্ষাৎ বা পত্রালাপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

মায়া কাঁদিল, ছায়াও কাঁদিল। সমস্ত দিন ভাবিয়া নানা প্রকার পরামর্শ করিল। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে একখানা বড় অঙ্কের চেক মায়া দারোয়ানকে দিয়া ভাঙাইয়া আনিল।

সন্ধ্যার পর মায়ার জিনিসপত্র নিজের বাক্সে ভরিয়া এবং মায়ার বিছানা নিজের শতরঞ্জিতে মুড়িয়া ছায়া এক সপ্তাহের জন্য সহসা পীড়িত মাসীমাকে শুশ্রূষা করিতে গেল। দুই দিন পরে বৈকালে রমেশদা আসিয়া মায়াকে লইয়া সিনেমায় গেল।

এক সপ্তাহ পরে ছায়া হস্টেলে ফিরিল খালি বাক্স লইয়া। শুনিল, মায়া হস্টেল হইতে পলাইয়াছে। সবাই ছি-ছি করিল। ছায়াও ছি-ছি-তে যোগ দিল। খবরের কাগজগুলি শতকরা দশখানা করিয়া বেশি ছাপা হইল।

৪

ছায়ার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় মিঃ মিটার থাকেন লক্ষ্ণৌয়ে। রমেশ মায়াকে এখানে রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে।

কয়েক মাস হইল, একজন বিলাতফেরত ডাক্তার এখানে আসিয়াছেন। এখনও শহরের বেশি লোকের সঙ্গে বেশি আলাপ হয় নাই।

মিঃ মিটারের কল পাইয়া ডাক্তার সাহেব রোগী দেখিতে আসিলেন। ব্যাগ ও স্টেথস্কোপ নামাইয়া রাখিয়া একখানি সোফার পাশে বসিলেন। পাশেই আর একখানা চেয়ার, এখানে রোগী বসিবে।

মিঃ মিটার মায়াকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ডাক্তারের সম্মুখে চেয়ারে বসিতে বলিলেন। মায়া একটু অগ্রসর হইয়া ডাক্তার সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়াই, 'দাদা' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মিঃ মিটার বলিয়া উঠিলেন, এ কি আপনার বোন ?

হ্যাঁ। আপনি একটু কাইণ্ডলি ও ঘরে যান। একটু ঠাণ্ডা জল পাঠিয়ে দেবেন কাউকে দিয়ে।

মায়ার মূর্চ্ছা ভাঙিয়াছে। দাদার পায়ের কাছে বসিয়া বলিল, দাদা, এতদিন তুমি চিঠি লেখ নি কেন ?

মায়া, আমার শরীর-মনের ওপর দিয়ে যে কি ঝড় ব'য়ে গেছে, তা তো জানিস না। আমার আর ইচ্ছে ছিল না, তোর সঙ্গে বা আত্মীয় কারও সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করি। সংসার থেকে দূরে থাকতেই আমি চাই। যাকগে, তোর ব্যাপার কি ?

দাদা, তুমি যদি সত্যিই এখনও আমাকে ভালবাস, তবে আমাকে এক ডোজ বিষ যোগাড় ক'রে দাও। তুমি সহজেই পারবে।

ডাক্তার সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, দেখ মায়া, তোর এসব সঙ্কল্প ছাড়। বাঁচবার অধিকার সকলেরই আছে। সমাজের কাছে লজ্জা ? সেও সইতে হবে। যে যুগের যা। প্রগতির বিদ্যুতে যে শুধু মানুষের আর সমাজের মন আলোকিত হবে তা নয়, মাঝে মাঝে শকও লাগবে, অ্যাক্সিডেন্টও হবে। নে, চল, এখন আমার বাসাতেই থাক। তারপর যা হয় দেখা যাবে।

কিন্তু—

কিন্তু আবার কি? এখুনি চল আমার সঙ্গে।

বহুদিন পরে এলাহাবাদের সেই বি. এস-সি. দাদা সেই ম্যাট্রিক বোনকে আদর করিয়া বাড়িতে লইয়া গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই যেন তাহাদের এলাহাবাদের দিন ফিরিয়া আসিয়াছে। পরস্পরের অকৃত্রিম ভালবাসার স্রোতে যেন তাহাদের গত জীবনের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত অশান্তি ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গেল। তাহাদের উভয়ের জীবন একটা অনাবিল স্বচ্ছ স্বাভাবিক মাধুর্যে ভরিয়া উঠিল। জগতে ভ্রাতা ভগিনীর স্নেহই বুঝি সর্বাপেক্ষা মধুর!

৫

মহীনদা, ওরফে মহীন্দ্রনাথ মুখার্জির তীর্থভ্রমণ শেষ হইয়াছে। কাঁহাতক টো-টো করা যায়! যেখানেই গিয়াছেন, যাহাই দেখিয়াছেন, কেবল মায়ার কথাই মনে পড়িয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারে জগৎটা যে মায়াময় হইয়া গিয়াছে, তাহা এই দীর্ঘ তীর্থভ্রমণের ফলেই মহীনদা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া ছায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে; তাহাকে মায়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, জানি না।

দেখিতে দেখিতে এক দুই করিয়া চার বৎসর কাটিয়া গেল। মায়ার আর লক্ষ্ণৌয়ে মন টিকিতেছে না। খোকার বয়স তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। কি জানি কেন, মায়া কলিকাতায় আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বি. এ.-তে অনার্স ছিল। কলিকাতায় মাতঙ্গিনী বিদ্যালয়ে একটি শিক্ষকতা জুটিয়া গেল। দাদাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য মাথার দিব্য দিয়া, খোকার হাত ধরিয়া মায়া ট্রেনে উঠিল।

বালিগঞ্জের একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে মায়া থাকেন। সঙ্গে খোকা। স্কুলের আরও একটি শিক্ষয়িত্রী মেয়ে এই ফ্ল্যাটেই থাকে। দুইজনেরই সব দিক দিয়া সুবিধা। বাড়ির সামনের দরজায় পিতলের প্লেটে লেখা—মিসেস মুখার্জি।

ছায়া মায়ার খবর নেয়, মহীনদারও খবর রাখে। মায়া ছায়াকে বলে, ওঁর কথা আমার কাছে আর বলিস নি। মহীনদা ছায়াকে বলে, মায়া আমার কথা কিছু বলে-টলে? ছায়া মায়াকে বলে, মহীনদা তোর কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে। ছায়া মহীনদাকে বলে, তুমি মায়ার কথা ভুলে যাও।

মহীনদা একদিন আসিয়া মায়ার সম্মুখে উপস্থিত। মায়া বলিল, মহীনদা, মানে, মিঃ মুখার্জি, কি চাই, মানে, কাকে চাই?

আপনাকে। দরজায় 'মিসেস মুখার্জি' লিখেছেন কেন?

বাংলা দেশে আপনি ছাড়া আর মুখার্জি নেই নাকি?

ও।

আচ্ছা, আসুন।

আরও দুই বৎসর পরে। খোকা স্কুলে ভর্তি হইল, খাতায় পিতার নাম লেখা হইল—এম. মুখার্জি। ছায়ার কাছে খবর পাইয়া মহীনদা আসিয়া মায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মানে কি?

মানে খোকার বাবার নাম মিঃ এম. মুখার্জি।

এসব লেখা কি ভাল হচ্ছে?

বাংলা দেশে আপনি ছাড়া এম. মুখার্জি কি আর কেউ নেই?

আপনার যা ইচ্ছে করুন, আমার কি?

আপনার তো কিছু নয়ই। আচ্ছা, আসুন তা হ'লে।

খোকা আসিয়া মায়ের আঁচল টানিয়া ধরিল। মহীনদা ফ্যালফ্যাল

করিয়া মাতাপুত্রের দিকে চাহিতে চাহিতে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

৬

এই নকল মিসেস মুখার্জির বুক ফুলাইয়া ব্যাগ-হাতে ছাতা-মাথায় চলা-ফেরা, নকল খোকা মুখার্জির স্কুলে যাতায়াত, আর আসল মহীনদার দূর হইতে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকানো—এটা বেশি দিন চলিল না। ছায়া ও রমেশদা একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। পাঁচ বৎসরের বিরহে মানসিক হেস্তনেস্ত প্রায় হইয়াই ছিল, যেটুকু বাকি ছিল তাহা হইয়া গেল মায়ার সহকর্মিনী এবং স্বগৃহবাসিনীর আর এক দা'র অভ্যুদয়ে। এই নূতন দা'টি বান্ধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বান্ধবীর বান্ধবী এবং তাহার খোকাটির সহিতও হৃদ্যতা ও আত্মীয়তা করিতে আরম্ভ করিলেন—অবশ্য নির্লিপ্ত আধুনিকভাবে। কিন্তু তবু আধুনিক মহীনদা এই নূতন অভ্যাগতের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া তাঁহার দাদাত্বের নির্লিপ্ততায় আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। ছায়ার নিকট গিয়া মহীনদা বলিলেন, আমি আর অপেক্ষা করতে রাজি নই।

কিন্তু আপনি যে ব্রাহ্মণ, আর মায়া কায়স্থ।

তা হোক।

আপনার মা-বাবা যদি মত না দেন?

তাতেও ক্ষতি নেই। আমার বিশ্বাস, বিয়ে হয়ে গেলে তাঁরা আর কিছু বলবেন না।

তাহলে কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে সবৎসা কায়স্থ-কন্যাকেই—

তুমি আর জ্বালিও না ছায়া।

ছায়া মায়ার কাছে গিয়া বলিল, আর তো দেরি করা চলে না।

কেন? বেশ তো আছি।

শেষে কি বিধবা হবি?

সধবাই বা কবে ছিলুম?

তোর কোন কথা আর শুনছি নে। আমি কিন্তু দিন ঠিক ক'রে ফেলেছি।

যা ইচ্ছে করগে যা।

ছায়া বাড়ি গিয়া রমেশদাকে ডাকিয়া পাঠাইল। উভয়ে মহীনদাকে লইয়া গেল মায়ার বাড়িতে। সেখান হইতে মায়া, তার স্বগৃহবাসিনী বান্ধবী এবং বান্ধবীর দা' মহাশয়কে লইয়া সটান রেজিস্ট্রি-অফিসে উপস্থিত হইল।

মায়া ও মহীনদার বিবাহ হইয়া গেল; সাক্ষী রমেশদা, ছায়া, বান্ধবী এবং তাহার দা'। অন্তরীক্ষ হইতে দেবতারা অদৃশ্য পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

ছায়া বলিল, মায়া, একটু দাঁড়া। আমরাও যাব তোদের সঙ্গে। ছায়ার সহিত রমেশদার—সদ্‌গোপীর সঙ্গে কায়স্থের—বিবাহ হইয়া গেল। সাক্ষী মায়া মহীনদা, বান্ধবী আর বান্ধবীর দা'।

বান্ধবীর দা' বান্ধবীকে বলিলেন, আর কেন, এস, আমরাও ঝুলে পড়ি।

সে কি! আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় তো মাত্র তিন মাসের—এখনও তো প্রেম হয় নি!

আচ্ছা, সে হবে এখন ধীরে সুস্থে, দরকারী কাজটা তো সেরে ফেলা যাক। সাক্ষী-টাক্ষী সব প্রস্তুত।

আমার মনের কথাগুলোও তোমাকে, মানে, আপনাকে বলা হয় নি।

মনের কথা? তার জন্যে আর ভাবনা কি! আমার কাছে কে. এম. ভি.-র একখানা রেকর্ড আছে, নাম ‘মনের কথা’। সেখানা রোজ বার দশেক ক’রে বাজিও, আমি ব’সে ব’সে শুনব, কেমন? নাও, এখন চলে এস।

বান্ধবী এবং বান্ধবীর দা’ ঝুলিয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সদ্‌গোপের বিবাহ হইয়া গেল।

খাতা দেখিয়া রেজিস্ট্রার মহাশয় বলিলেন, আপনারা যদি একটু অদল-বদল ক’রে নিতেন, তা হ’লে আর রেজিস্ট্রি করবার দরকার হ’ত না।

উপদেশটা সকলেরই অযাচিত বলিয়া মনে হইল।

এপ্রিল, ১৯৪৮

দার্জিলিং

১

দার্জিলিং।

বার্চহিল রোডের পাশে একখানি সুদৃশ্য ছোট বাড়ী—ঠিক যেন একখানি ছবি। রাস্তার ধারে একটি ছোট গেট। গেট পার হইলেই দুই দিকে দুইটি লাল কাঁকর-বিছানো পথ। পথ দুইটি পুনরায় বাড়ীর সিঁড়ির সম্মুখে গিয়া মিশিয়াছে। পথের এক পাশে গাঁদাফুলের সারি, অপর পাশে ক্রিসান্থিমামের ঝাড়। ছোট মাঠটির মাঝখানে অনেকগুলি ডালিয়া গোল করিয়া সাজানো। সিঁড়ির দুই পাশে দুইটি বড় রডডেনড্রন গাছ; গোটাকয়েক বড় কুঁড়ি হইয়াছে, এখনো ফুল ফোটে নাই। সিঁড়ির পাশ হইতে আরম্ভ করিয়া বারান্দার পাশ দিয়া দুই দিকে দুই সারি ক্ষুদে-গোলাপের গাছ। বারান্দার উপরে দুই দিকে অনেকগুলি নানা আকারের এবং নানা শ্রেণীর অর্কিড ঝুলিতেছে; নীচে নানা প্রকার ফার্ণের টব সাজানো রহিয়াছে। বাড়ীখানির দুই পাশে দেওয়ালের গায়ে ঘন আইভিলতা বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ছোট্ট পরিচ্ছন্ন বারান্দার মাঝখানে একখানি গোল বেতের টেবিল; দুই পাশে দুই খানি বেতের চেয়ার। পিছনেই ড্রইংরুমে ঢুকিবার দরজায় একটি হালকা রঙীন পরদা ঝুলিতেছে।

বিকাশবাবু পরদাটা একটু সরাইয়া ড্রইংরুমে ঢুকিলেন। ঘরের সমস্ত মেঝেটাই পুরু কার্পেটে মোড়া। মাঝখানে একখানি কাশ্মীরী সূক্ষ্ম-কাজ-করা টেবিল। তার উপরে একখানি জয়পুরী পিতলের

থালা। তার মাঝখানে একটি পিতলের ফুলদানিতে কয়েক প্রকার সিজন্‌-ফ্লাওয়ারের একটি তোড়া। ঘরের চারি পাশে অনেকগুলি সোফা এবং ঈজিচেয়ার সাজানো রহিয়াছে। একটি জানালার ভিতর দিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশ্রেণীর অপূর্ব শোভা দেখা যাইতেছে।

বিকাশবাবু যখন ঘরে ঢুকিলেন, তখন ঘরে মাত্র আর একজন ছিলেন। বিকাশবাবু সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়াই খোলা জানালাটি সম্মুখে রাখিয়া একখানি সোফার এক পাশে বসিলেন এবং গৃহস্বামী মিঃ ভট্টাচারিয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ভট্টাচারিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ধনবান্, উদারপ্রকৃতি, মহাশয় ব্যক্তি। তিনি যে শুধু বিলাত-ফেরত-সুলভ বাহ্য উদারতার আড়ম্বর লইয়াই তৃপ্ত তাহা নহে; তাঁহার চিন্তা, তাঁহার বাক্য, তাঁহার কার্য, তাঁহার সামাজিক মত, তাঁহার পারিবারিক ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই একটা উদার বিশ্বজনীন নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত। এই কারণেই তিনি সমাজের প্রায় সকল স্তরের এবং সকল সম্প্রদায়ের কাছেই শ্রদ্ধা এবং ভক্তি অর্জন করিতে পারিয়াছেন।

একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন সন্নিকট। এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিবার জন্য মিঃ ভট্টাচারিয়াকে অনুরোধ জানাইতে এবং তাঁহার সম্মতি লাভ করিতেই বিকাশবাবু এখানে আসিয়াছেন।

বেলা প্রায় সাতটা। বেয়ারা জানাইয়া গেল, সাহেব আর একটু পরেই আসিবেন।

বিকাশবাবু মিঃ ভট্টাচারিয়ার নাম শুনিয়াছেন বহু পূর্বে এবং বহুমুখে, কিন্তু কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে কি বলিবেন এবং কি ভাষায় কেমন করিয়া বলিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে বিকাশবাবু ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে কয়েকবার নিরীক্ষণ

করিয়াছেন। লোকটি বাঙালী নহে। পায়ে বার্ণিস-করা জুতা, পরণে মালকোঁচার মত পরা ধুতি এবং লম্বা গলাবন্ধ কোট। দুই কানে দুইটি সরু মাকড়ি। মাথা খালি, একটি কাল গোল টুপি পাশেই রহিয়াছে। দেখিলে সহজেই বোঝা যায়, লোকটি কাপড়ের ব্যবসা করে; হয়তো মিঃ ভট্টাচারিয়ার নিকট জামা-কাপড়ের অর্ডার লইতে আসিয়াছে। পাশে একখানি খবরের কাগজের কয়েক পাতা আধখোলা অবস্থায় পড়িয়া আছে; একখানি পাতা তাহার কোলে—বোধ হয় মার্কেট রিপোর্ট।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর মিঃ ভট্টাচারিয়া আসিলেন। পায়ে ভেলভেটের চটী, পরনে ঢিলা পাজামা, গায়ে ড্রেসিং গাউন, মুখে বর্মা চুরুট। মুখ দেখিলেই বোঝা যায়, সদাশিব মানুষ। সমস্ত দেহ-মন যেন এ পৃথিবী ছাড়িয়া অন্য কোন লোকে বিরাজ করিতেছে। সাক্ষাৎ হইতেই বিকাশবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কিন্তু ঠিক যেমন বসিয়া ছিলেন, তেমনই বসিয়া রহিলেন। মিঃ ভট্টাচারিয়াও সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিলেন বলিয়া মনে হইল না।

উভয়ে পুনরায় উপবিষ্ট হইবার পর বিকাশবাবু তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন। মিঃ ভট্টাচারিয়া স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত বিকাশবাবুর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আরও দু-একটি সাধারণ ভদ্রালাপের পর মিঃ ভট্টাচারিয়া গৃহের তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখাইয়া বলিলেন, এঁকে বোধ হয় আপনি চিনতে পারেন নি।

আজ্ঞে, না।

এঁর নাম গরমলাল শীতলরাম, আমার মেজ জামাই।

আকস্মিক এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত বিস্ময় বহু কষ্টে দমন করিয়া

বিকাশবাবু শীতলরামবাবুকে নমস্কার করিলেন। শীতলরামবাবু বলিলেন—নমস্কার, রাম রাম।

বিকাশবাবু মিঃ ভট্টাচারিয়াকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া আসিলেন।

২

সমস্ত দিন বিকাশবাবুর নানা কাজে কাটিল। সভামণ্ডপ নির্মাণ, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ, কার্যসূচী-প্রণয়ন, উদ্বোধন-সঙ্গীতের ব্যবস্থা, বক্তৃতার ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতি বহুবিধ কাজে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাপৃত রহিলেন।

সভার কার্য আরম্ভ হইল। উপস্থিত ভদ্রমহোদয় এবং মহিলাবৃন্দের মধ্যে বিকাশবাবুর স্ত্রী এবং ভট্টাচারিয়া মহাশয়ের জামাতাও উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে শীতলরামবাবুও উঠিয়া মাড়োয়ারীসুলভ বাংলা ভাষায় একটি ছোট বক্তৃতা করিলেন। মাড়োয়ারীর বাঙালী-প্রীতি দেখিয়া অনেকেই করতালি দিলেন।

সভার কার্য শেষ হইলে যথারীতি বিদায়-সম্ভাষণের পর সভাপতি মহাশয় শীতলরামবাবুর সঙ্গে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। অন্যান্য সমবেত জনমণ্ডলী ক্রমশঃ স্ব-স্ব গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিকাশবাবু পথ চলিতে চলিতে স্ত্রীকে বলিলেন—চল, বাড়ী গিয়ে তোমাকে একটা অদ্ভুত সংবাদ দেব।

স্ত্রী বলিলেন—চল, বাড়ী গিয়ে আমিও তোমাকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাব। সমস্ত দিন নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তোমাকে দেখাতে পারি নি।

বিকাশবাবু বলিলেন—জিনিসটা কি, বল না?

বাড়ী চল, তার পরে বলব। সেটা কানে শোনবার চেয়ে চোখে দেখাটাই ভাল হবে। তোমার অদ্ভুত সংবাদটা কি, শুনি?

সেটাও বাড়ী গিয়েই শুনো।

৩

ভীষণ শীত। বিকাশবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী বাড়ী ফিরিয়াই মুখ হাত ধুইয়া, অল্প কিছু আহারাদি করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া আগুনের পাশে বসিয়া পড়িলেন। সারা দিনের ক্লান্তির পর আর এক মুহূর্তও কাহারও বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু উভয়ে উভয়ের যে কৌতূহল উদ্রেক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত কেহই শুইতে রাজি নহেন। বিকাশবাবু বলিলেন—নাও, এইবার বের কর তোমার অদ্ভুত জিনিস।

তোমার অদ্ভুত সংবাদটা আগে বল।

না, তুমি আগে।

না, তুমি আগে।

নাঃ, তোমার সঙ্গে আর পারি নে। নেহাৎ আজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, নইলে—। যাক্ শোন তবে! ঐ যে একটা মাড়োয়ারী সভায় বক্তৃতা করল—

হ্যাঁ, তা কি? লোকটা বেশ বাংলা বললে কিন্তু।

ও হচ্ছে আমাদের সভাপতি মিঃ ভট্টাচারিয়ার মেজ জামাই।

অ্যাঁ—, ওই নাকি সেই—?

সেই, মানে? তুমি ওকে চেন নাকি?

না, আমি চিনি না। আমি যে অদ্ভুত জিনিসটার কথা তোমাকে বলছিলাম, এই নাও দেখ।

বিকাশবাবুর স্ত্রী তাঁহার স্বামীর হাতে একখানি এন্‌ভেলপ দিলেন। বিকাশবাবু এন্‌ভেলপের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

৪

ভাগলরাম হাউস,
লুধিয়ানা।

ভাই মিলি,

বহুকাল পরে আজ তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। আমার কথা তোমার মনে আছে কি না, তাই বা কে জানে! তবু আশা করি, এ-চিঠিখানা পেলে নিশ্চয়ই মনে পড়বে।

মনে আছে বোধ হয়, বি. এ. পাস করবার পর যখন আমরা হোস্টেল ছেড়ে এলাম, তখন আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে অন্ততঃ মাসে একবার ক'রে আমরা আমাদের সুখদুঃখের কথা পরস্পরকে জানাব। বিয়ের আগে পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলাম। তুমি অবশ্য বিয়ের পরেও দু-তিনখানা চিঠি লিখেছ, কিন্তু আমিই বোধ হয় আমাদের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য দায়ী। আমার বিয়েটা যখন যে-ভাবে হয়ে গেল, আর তার পরে আমার যে জীবনযাত্রা সুরু হ'ল, তাতে চিঠিপত্র লেখার আগ্রহ আর অভ্যাস কিছুই রইল না।

এত দিন পরে চিঠি লিখছি কেন? আমার মনে হয়, আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ মানুষ যে জন্য বেঁচে থাকে, তার কিছুই আমার আছে ব'লে মনে হয় না। কাজেই আমার এ চিঠি আমার প্রেতাত্মার চিঠি বলেও মনে করতে পার। আমার এ ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘশ্বাস অন্ততঃ এক জন মরমীর কাছে পৌঁছে দিতে পারলেও যেন একটু শান্তি পাব।

নাচ, গান, হাসি, রসিকতার জন্য যে মেয়ে কলেজের সকলের কাছে প্রশংসা পেয়ে এসেছে, বন্ধুবান্ধবের কাছে যে কোন দিন কোন কারণেই মুখভার করে নি, তার কাছ থেকে এমন কথা শুনে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হচ্ছ! আচ্ছা, তবে একটু গোড়া থেকেই বলি—ধৈর্য হারিও না কিন্তু। এইখানাই আমার শেষ চিঠি। তোমাদের সহজ সুন্দর জীবনযাত্রার মাঝে আমার জীবনের করুণ কাহিনী যদি একটু অশান্তির সৃষ্টি করে, তবে ক্ষমা ক'রো।

হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যখন বাড়ীতে এলাম, বিয়ের সম্বন্ধ হ'তে লাগল। মা ও বাবাব আত্মীয়, অনাত্মীয়. পরিচিত ও অপরিচিত অনেকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। চা খাওয়া, গান গাওয়া, ব্রীজ খেলা, টেনিস খেলা, পিক্‌নিক্, বেশ চলতে লাগল, কিন্তু বিয়ের ফুল ফুটল না। যারা আসত, যেত, বিয়ে করার দিকে বিশেষ ঝোঁক তাদের ছিল ব'লে মনে হ'ত না। আসত যেন একটু সময় কাটাতে, একটু আমোদ করতে। মা আমাকে বকতেন, আমি কেন ওদের সঙ্গে একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা করিনে। প্রথমটা আমার অত্যন্ত খারাপ লাগত, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে। কিন্তু, উপায় কি? ঘটকের মারফৎ পাত্র খুঁজে, আর সেজেগুজে পাত্রের আত্মীয়-স্বজনের সামনে রূপ-গুণের পরীক্ষা দিয়ে বিয়ে করাটা তো আর আমাদের বাড়ীতে সম্ভব নয়! ভাল না বেসে তো বিয়ে করা যায় না! অথচ ভালবাসি কাকে?

এখন মনে করলে হাসি পায়, কিন্তু সত্যিই একবার ভাল বেসেছিলাম। মার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, ডাক্তারি পাস ক'রে মেডিক্যাল কলেজে হাউস-সার্জন হয়েছিল। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনই স্বভাব, আমার তো খুব ভাল লেগে গেল। কথাটা যখন একটু জানাজানি হ'ল, মাসিমা এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন. 'ডাক্তারি একটা

পাস করলেই তো হয় না। অমন দু-টাকার ডাক্তার কলকাতার অলিতে-গলিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। চাল নেই, চুলো নেই—' কথাগুলো আকারে ইঙ্গিতে তাঁকেও বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁর সঙ্গে দেখাশুনাও শেষ হ'ল। মনটা কিছু দিন খুবই খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মন খারাপ ক'রে ব'সে থাকলে নভেল নাটকের নায়িকাদের চলতে পারে। বাস্তব মানুষের চলে না।

হাসি, গান, সিনেমা, পার্টি, পিক্‌নিক্ চলতে লাগল। উকিল, ব্যারিস্টার, প্রফেসর, ব্রোকার, অনেকের সঙ্গেই আলাপ হ'ল। এদের প্রায় সকলেই একে একে ঘটক-প্রস্তাবিত, পিতামাতা-নির্বাচিত, বন্ধুবান্ধব-মনোনীত পত্নীকেই ভালবাসা সমীচীন মনে করলেন। অপর কয়েকজন পবিত্র কৌমার্যব্রত অবলম্বন ক'রে কুমারীদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে বেড়াতে লাগলেন। আর দু-এক জন যে আমাকে পছন্দ করলেন না, একথা অবশ্য আমি বলছি নে, কিন্তু আমি তাদের পছন্দ করতে পারলুম না।

এমনি ক'রে বছর কেটে গেল। কয়েক দিনের অসুখে মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমি যেন একেবারে অবলম্বনশূন্য হয়ে পড়লাম। বাবা চিরকালই সদাশিব মানুষ। বাইরের ঝড়-বাতাসে সহজে ব্যাকুল হন না। তিনিও যেন কেমন গম্ভীর নিরানন্দ হয়ে গেলেন। আমার মাসিমা প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়ীতে। সংসারের মোটামুটি তত্ত্বাবধানটা তিনিই করতে লাগলেন। খুঁটিনাটির ভার পড়ল আমারই উপর।

এমনি সময়ে আমার ভাগ্যাকাশে উদয় হলেন আমার ভাবী স্বামী। এঁর বাবার সঙ্গে আমার বাবার আলাপ হয়েছিল ব্যবসায়-সূত্রে। ইনি বি. এ ক্লাসে উঠেই পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে পিতার ব্যবসায়ে

যোগ দেন। পরে ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই ইউরোপ এবং আমেরিকা যান এবং প্রায় সাত-আট বৎসর পরে দেশে ফেরেন। আমার সঙ্গে আলাপ খুব সহজেই হ'ল। খুব স্মার্ট, খুব অমায়িক, খুব আলাপী। সর্বদা স্যুট পরেই আসতেন আমাদের বাড়ীতে। জানই তো, আধুনিক বাঙালীর কাল্‌চারের সঙ্গে পেন্টুলনের সম্পর্কটা যেমন ঘনিষ্ঠ তেমনি পুরাতন। তাঁর সঙ্গে মিশবার সময়ে মনেই হ'ত না, কোন বিজাতীয় লোকের সঙ্গে মিশছি। বাংলা, ইংরেজী দুটোই ইনি খাসা বলতেন। কিছু দিন আলাপের পর মাসিমা এক দিন বাবাকে বললেন, 'ডলিকে শীতলের সঙ্গে বিয়ে দিলে কেমন হয়?' বাবা খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে পরে বললেন, 'আচ্ছা, ডলিকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখো তো এক সময়ে।'

মাসিমা এক দিন সত্যিই আমাকে আমার মত জিজ্ঞেস করলেন। আমি পড়লুম ভারি মুশকিলে। শীতলবাবুকে আমার ভালই লাগত। তাছাড়া, অর্থ, সম্পত্তি, বাড়ী, গাড়ী, সামাজিক উদরতা, কাল্‌চার, কিছুরই অভাব তখন ছিল না। অথচ, উনি যে বাঙালী নন, শুধু এই কথাটাই মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগল। মাসিমাকে বললুম, 'আচ্ছা ভেবে দেখি।'

ভাবতে লাগলুম। আমার মা বেঁচে থাকলে হয়তো এক মিনিটেই সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু আমার তা হ'ল না। একে সমস্ত দিনটা আমার একেবারে ফাঁকা—আমার জীবনেরই মত। তার পর, বছরের পর বছর আমার বন্ধুদের যে ব্যবহার, যে রুচি, যে দায়িত্বজ্ঞান, যে উদারতা দেখে এসেছি, সে-সব মনে হ'লেই মনটাকে যেন কিছুতেই স্থির করতে পারতুম না। এখন এই বয়সে জীবনের সমস্যাগুলিকে যে-মনে যে-চোখে দেখি, তখন তো সে চোখ ছিল না, সে মনও ছিল

না। সে বয়সে মানুষ জীবনের মাধুর্যের দিক, আশার দিক, কল্পনার দিকটাই বড় করিয়া দেখে; তিক্ততার দিক, নৈরাশ্যের দিক, বাস্তবের দিকটা তেমন চোখে পড়ে না। আমি ভাবতে লাগলুম, শুধু বাঙালী নন, এই সামান্য কথাটা ভুলতে পারব না? এই একটা কথা ভুল্‌তে পারলেই তো সব সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়!

ভুল্‌তে না পারলেও মনে মনে ঠিক করলুম, ভোলা উচিত। মন ঠিক ক'রে মাসিমাকে জানালুম, মাসিমা বাবাকে বল্‌লেন। বাবা কিছু বল্‌লেন না। তাঁর মৌনকে সম্মতিলক্ষণ ব'লে ধরে নিয়ে মাসিমা বিয়ের উদ্যোগ করতে লাগলেন। বাবা বাধা দিলেন না। আমিও বুঝলুম, বাবার মত আছে।

বিয়ে হয়ে গেল। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত প্রতিবেশীদের কেউ খুশী হলেন, কেউ দুঃখিত হলেন, কেউ কিছুই হলেন না। আমি? বোধ হয় খুশীই হয়েছিলাম। যাক্, নূতন জীবন সুরু হ'ল। কয়েক বছর বেশ কাটল। এঁদের মস্ত বাড়ী। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের চাল-চলন, বেশ-ভূষা, কথাবার্ত্তা অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হ'লেও আমার বিশেষ ক্ষতি হত না। আমি আমার মত থাকতাম। আমার নিজের পরিচিত ও আত্মীয়মহলে আমার স্থান আগের মতই রইল। এঁদেব বাড়ীর লোকের কাছে 'বাঙালী বিবি' আখ্যা পেলেও আমার তাতে এসে যেত না। কারণ মনে মনে তারা আমাকে শ্রদ্ধা করত।

কিন্তু অদৃষ্টের চাকা ঘুরল। এঁদের ব্যবসায়ে এবং পারিবারিক ব্যবস্থায় একটা বিপর্যয় উপস্থিত হ'ল। সব খুঁটিনাটি লিখে কোন লাভ নেই। মোট কথা, অবস্থা দাঁড়াল এই যে, এঁদের ব্যবসায় আর এঁদের বাড়ীর সঙ্গে আমার স্বামীর একটা স্থায়ী বিচ্ছেদ উপস্থিত হ'ল। দারিদ্র্যের বিভীষিকা মনকে একটু বিচলিত করেছিল বটে, কিন্তু তার

চেয়েও বেশী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লাম এই ভেবে যে হয়তো বাধ্য হয়ে কল্‌কাতা ছাড়তে হবে। বাবাও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার স্বামীও খুব চেষ্টা করতে লাগলেন, কল্‌কাতাতেই ব্যবসা গুছিয়ে নেবার।

কিন্তু হ'ল না। লুধিয়ানায় আমার স্বামীর পিসতুত ভাইয়ের একটা বড় কারবারে একজন দক্ষ লোক আবশ্যক হওয়ায় তাঁরা অনেক ব'লে ক'য়ে আমার স্বামীকে সম্মত করালেন। মনে মনে আমার যতই আপত্তি থাক, প্রায় নিঃসম্বল স্বামীকে এমন সুযোগ হারাতে অনুরোধ করতে পারলুম না। স্বামীও আমার মনের কথা বুঝলেন। বললেন, 'এখন তো যাই। তার পর কিছু সঞ্চয় ক'রে নিয়ে আবার কল্‌কাতায় ফিরে আসা যাবে।' আমরা কলকাতা ছাড়লুম। বাবা একেবারে ভেঙে পড়লেন।

এখানে এসে অবধি প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বুঝতে আরম্ভ করলুম, আমার বাঁঙালীত্বটাকে ভোলা কত কঠিন। এখানে এসে একেবারে একা হ'য়ে পড়লুম। আত্মীস্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। আমাকে এখন থেকে মনে প্রাণে মাড়োয়ারী হবার সাধনা করতে হ'ল। মানুষের দাম্পত্য-জীবনে একটা সময় শীঘ্রই আসে, যখন তাদের নিজেদের চিন্তা, কার্য, স্নেহ-মমতা, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি সবই দুই জনের ছোট গণ্ডী পার হয়ে পরিবারে, সমাজে, দেশে, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মনের এই মহতী প্রেরণা থেকেই বর্তমান সময়ের পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ গড়ে উঠেছে। বুঝি সবই। কিন্তু পারি কই? এদের পরিবারের সঙ্গে, এদের সমাজের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে তো পারলুম না।

প্রতিদিনের প্রতি কাজে আমার বহু জন্মার্জিত সংস্কারের সঙ্গে এখানকার খাপছাড়া প্রথা, অভ্যাস, ব্যবহার, কথাবার্তা, পারিবারিক আদর্শের সংঘাত চলতে লাগল। আমার শাশুড়ী আমার সঙ্গেই এখানে

এসেছিলেন। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু বিভিন্ন সংস্কারের সংঘাত যে কত ভীষণ হ'তে পারে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

একটি ছোট্ট খোকা এল, ঘর আলো ক'রে। তার খাওয়া, শোওয়া, জামা-পরা সব প্রথমত আমার মতেই চলল। কিন্তু একটু বড় হতেই, এরা তাকে মাড়োয়ারী ক'রে তুলতে আরম্ভ করল, মাড়োয়ারীর ছেলে মাড়োয়ারী হবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পেটের ছেলের মাড়োয়ারী রূপ দেখে আমার অন্তরাত্মা যে গুমরে কেঁদে উঠতে লাগল। সে যে বই পড়তে লাগল, তার এক বর্ণও আমি বুঝি নে। আমার ছেলেকে আমি অ, আ, ক, খ পড়াতে পারবো না, এত বড় শাস্তি আমায় পেতে হবে, তা তো আগে ভেবে দেখি নি। আমার কাছে সে বাংলা বলতে শিখল বটে, কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময় সর্বত্র সে তো এদের ভাষাই শিখতে লাগল। এদের অভ্যাস, আচার-ব্যবহার ক্রমেই সে আয়ত্ত করতে লাগল। আমার যে কি মনে হ'তে লাগল, তা অন্তর্যামীই জানেন!

এখন মনে পড়ে আইরিনের কথা। আমার পিস্‌তুত ভাই রমেশ-দাকে বোধ হয় দেখেছ। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আইরিনকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলেন কলকাতায়। আমাদের সঙ্গে মিশতে তার কষ্ট হ'ত। কত চেষ্টা ছিল তার, নিজেকে বাঙালী ক'রে ফেলতে। কত ঠাট্টা ক'রেছি তার চালচলনের। তবু তো আমাদের চালচলন ইউরোপীয়দের চালচলনের কত কাছাকাছি। আইরিনের ছেলেটি বাংলা, ইংরেজী দুই ভাষাতেই কথা বলত। আমরা চাইতাম তাকে বাঙালী ক'রে নিতে, তার মা চাইত—অবশ্য মনে মনে—তাকে ইংরেজ করতে। এই দোটানায় পড়ে বেচারী আইরিনের যে কি অবস্থা হয়েছিল, তা এখন

বুঝচি মর্মে মর্মে। ইংলণ্ডে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, ভারতবর্ষেও তার সত্তা সার্থক হ'তে পারে নি। আমিও তাই ভাবি, বাংলাকে যখন ছেড়েছি, তখনই আমার সত্তা লোপ পেয়ে গেছে।

স্বামী-স্ত্রীর জীবনটা তো শুধু স্বামী-স্ত্রীতেই শেষ নয়! তা যদি হ'ত, তাহ'লে আমার মনের এ দ্বন্দ্ব, এ নৈরাশ্যের কোন কারণই ছিল না। মানুষের সম্বন্ধ তার সন্তানসন্ততির সঙ্গে, তার পিতামাতা আত্মীস্বজনের সঙ্গে, ভৃত্যপরিচারিকার সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, অগণিত ধনী, দরিদ্র, দাতা, ভিক্ষুক, সুস্থ, রুগ্ন, সৎ, অসৎ নরনারীর সঙ্গে। গাছ যেমন তার চারিদিকে বিস্তৃত অগণিত শিকড় দিয়ে রস সংগ্রহ ক'রে ফলে, ফুলে, পাতায় সমৃদ্ধ হয়, তেমনি মানুষের মনও সমাজের বিভিন্ন আবেষ্টনী থেকে ভাব-রস সংগ্রহ ক'রে সমৃদ্ধ হয়—সার্থক হয়। যখনই আমাকে বাংলার মাটি থেকে উপড়ে আনা হয়েছে, তখনি আমার জীবনের পনর আনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাংলার ধুলো, বাংলার কাদা, বাংলার মাঠ, বাংলার নদী, বাংলার গাছ, বাংলার লতা, বাংলার বন, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার নদী, বাংলার পাহাড়, বাংলার ফল, বাংলার ফুল, বাংলার ধান, বাংলার মাছ, বাংলার কথা, বাংলার ভাষা, বাংলার হাসি, বাংলার গান, বাংলার মা, বাংলার ভাই, বাংলার বোন, বাংলার সই, বাংলার সুখ, বাংলার দুঃখ, বাংলার আশা, বাংলার নিরাশা,—এই সব দিয়েই তো গড়া আমার দেহমনের প্রতি অণু-পরমাণু। এদের বাদ দিয়ে আমার আর থাকল কি?

তুমি হয়ত বলবে, তুমি তো ইচ্ছা ক'রেই মাড়োয়ারী হয়েছ। কেন আমার এ ইচ্ছে হ'ল, সে তো আগেই বলেছি। এ ইচ্ছে আমার হয় কেন? আজ আমার অভিমান মিঃ রাম, মিঃ শ্যাম বা মিঃ যদুর 'পরে

নয়, আমার অভিমান সমগ্র বাংলার ছেলেদের 'পরে। কেন তারা বাংলার মেয়েকে নির্বাসিত করে? রূপের অজুহাতে, গুণের অজুহাতে বংশের অজুহাতে, কোষ্ঠীর অজুহাতে, পিতামাতার অজুহাতে, আয়ের অজুহাতে এবং বিনা অজুহাতে তারা বাংলার লক্ষ্মীপ্রতিমাগুলিকে কেন বিসর্জন দেয়? বীরত্বের বড়াই তো খুব শুনি! বাংলা কাগজ একখানা রেখেছি—বাংলার খবর তাতে পাই। আমার এই প্রবাসের কয় বৎসরের মধ্যেই তো কয়েক শত নির্যাতিতাদের খবর পড়লুম। কোন বীর পুরুষের গায়ে একটু আঁচড় লেগেছে বলে তো খবর পাই নি।

মাঝে মাঝে শুনি, ছেলেরা ভয় পায়, আমাদের খরচ ওরা কুলোতে পারবে না। কেন? আমরা কি এতই খাই, এতই পরি? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হয়। যার আয় এক-শ টাকা, সে জজসাহেবের মেয়ে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে কেন? যে-দেশের বউয়ের দু জোড়া শাড়ি আর দুটো সেমিজে তিন মাস চলে, আর তার সঙ্গে দু-বেলা দুটো খাওয়ার বিনিময়ে যারা সকাল থেকে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত মুখ বুজে খাটে, পরিবারের কল্যাণ-প্রচেষ্টা ছাড়া যারা অন্য কোন কর্তব্য জানে না, তাদেরও যারা অনাবশ্যক এবং দুর্মূল্য মনে করে, তাদের পৌরুষকে ধিক্! শহরের দু-চারটে হঠাৎ-ধনী, হঠাৎ-কালচার্ড, শিকলছেঁড়া মেয়েদের চালচলন দেখেই বাংলার মেয়েদের ভাগ্য-বিচার করা কতখানি অন্যায়, তা হয়তো এই ছেলেগুলো ভেবে দেখে না। আর মেয়েদের অস্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতা শিখিয়েছে কারা? ওরাই তো দু-চার দিন এদেশ-ওদেশ ঘুরে এসে মনে করে, দুধের চেয়ে পেট্রল দরকারী বেশী, স্বামীর নিরাড়ম্বর প্রেমের চেয়ে ড্রইং-রুমের ইয়ার্কি লোভনীয় বেশী, ছেলেমেয়ের ঝঞ্ঝাটের চেয়ে সিনেমা হোটেলের আকর্ষণ বেশী।

যাক্ গে, চিঠি লম্বা হ'য়ে যাচ্ছে। লম্বা লম্বা বক্তৃতা ক'রে তোমায়

বিরক্ত করতে চাই নে। আমার অভিশপ্ত জীবনের একটু পরিচয় তোমায় দিলুম, কিছু মনে ক'রো না। আমার যা হবার, তা হ'য়ে গেছে। কিন্তু ছেলেটাকে কিছুতেই ছাড়তে পারছি নে। যদি ওকে বাঙালী ক'রে যেতে পারি, এ ব্যর্থজীবনের শেষে একটু সান্ত্বনা হয়তো পাব। অনেক ব'লে ক'য়ে, অনেক বুঝিয়ে, অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে ওঁকে পাঠিয়েছি বাংলা দেশে—আমার সাধের বাংলা দেশে—যদি আবার কলকাতায় একটা ব্যবসার কিছু সুবিধে করতে পারেন। ওখানে গিয়ে যদি আমায় দু-বেলা রেঁধে খেতে হয়, তাতেও আমি দুঃখ করবো না। খোকাকে আমি বাঙালী করতে চাই। আমি মরেছি, কিন্তু খোকাকে আমি বাঁচাতে চাই!

বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আজ আর না। বিকাশবাবুকে আমার নমস্কার জানিও। তুমি আমার—কি বলবো?—অনেক দিন আগেকার হোস্টেলের কথা মনে হচ্ছে—না থাক্—তুমি হাসবে! আমার হাসার বা হাসাবার দিন ফুরিয়ে গেছে। ইতি

তোমাদের ডলি।

পত্র পড়া শেষ হইলে বিকাশবাবু বলিলেন—শুনলে?

হ্যাঁ।

কি করা যায় বল তো?

যেমন করে হোক, ডলিকে কলকাতায় আনতেই হবে।

দেখি চেষ্টা ক'রে। কালই শীতলবাবু আর মিঃ ভট্টাচারিয়ার সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

বেশ, যেও।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮

প্রয়োজন

ছোট একখানি ঘর। বেশ সাজানো গুছানো। একপাশে একখানি খাট। ছত্রীর পরে মশারি গুটানো রহিয়াছে। বিছানা একখানা বেগুনী রংএর শুজনী দিয়া ঢাকা। পাশে একটি ছোট টিপয়ের উপর একটি গ্লাস, জল নাই। ঘরের দেওয়ালের একপাশে একখানি আলনা। আলনায় নানা রংএর এবং নানা ডিজাইনের খানকয়েক শাড়ী, গোটাকয়েক ব্লাউজ, সেমিজ, খান দুই তোয়ালে, গোটা দুই সায়া, দুইখানা মাফ্‌লার প্রভৃতি কতক গুছানো, কতক অমনি রহিয়াছে। আলনার নীচের থাকে দুই জোড়া চটী, আর তিন চার জোড়া উঁচু-গোড়ালি, নীচু-গোড়ালি এবং মাঝারি-গোড়ালি জুতা সাজানো রহিয়াছে। আলনার উপরে ডানদিকে দুইটি বেঁটে ছাতা ঝুলিতেছে। আর একটি দেওয়ালের পাশে একখানা বইয়ের শেল্‌ফ্‌। তাহাতে সাজানো রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের চার পাঁচ খানা বই, অনুরূপা দেবী, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতি আধুনিক লেখিকা এবং লেখকগণের দশ বার খানা বই। এভ্রিম্যান সিরিজের পাঁচ ছয় খানা, পেঙ্গুইনের খান আষ্টেক, ছ-পেনি সিরিজের খান দশেক বইও আছে। একখানি রামায়ণ, একখানি মহাভারত, তার পাশে দেখা যাইতেছে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের সমগ্র কবিতা-সংগ্রহ। একখানা পিয়ার্সের স্নাইক্লোপেডিয়া আর একখানা অক্‌স্‌ফোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইংরাজি অভিধান একপাশে রহিয়াছে। এগুলি

ছাড়া অনেকগুলি ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে—ইংরাজি সিলেক্‌সন, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি।

ঘরের আর একপাশে একখানি চৌকি, শতরঞ্চি দিয়া ঢাকা। ইহার পরে ছড়ানো রহিয়াছে অনেকগুলি খাতা ও বই। খাতাগুলির অধিকাংশই ইস্কুলের মেয়েদের এক্‌সারসাইজ বুক এবং বইগুলি সবই ইস্কুলের বই। একপাশে একটা লালনীল পেন্সিল পড়িয়া আছে—আর একপাশে একখানা দৈনিক খবরের কাগজ, তাহার একটা পাতা উড়িয়া ঘরের মেঝেয় লুটাইতেছে।

ঘরের এক কোণে একখানি ড্রেসিং টেব্‌ল্। মাঝখানে একখানি লম্বা-গোল আয়না। টেলিলের উপর গোটাকয়েক স্নো, পাউডার প্রভৃতির শিশি, চিরুণী, প্রভৃতি সাজানো এবং ছড়ানো আছে। একপাশে একটি হ্যাণ্ডব্যাগ পড়িয়া আছে। ড্রেসিং টেবিলের পাশেই বাথরুমের দরজা দেখা যাইতেছে, অল্প একটু খোলা। আর একপাশে একটি ছোট চৌকির উপর একটি জলের কুঁজা, মুখে একটি কাচের গ্লাস। ড্রেসিং টেবিলের গায়ে ছোট দুইটি ড্রয়ার। তাহার মধ্যে কি কি আছে, তাহা দেখা যাইতেছে না।

আলনা এবং ড্রেসিং টেবিলের মাঝখানে দেওয়ালের পাশে একটি চ্যাপ্‌টা ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্কের উপরে একটি ছোট সুটকেস। ইহার উপরে দেওয়ালের গায়ে একটা মোটা পেরেক হইতে একটি ছিটের ঢাকনি-পরানো এস্রাজ ঝুলিতেছে।

চৌকির পাশে একখানি ডেক-চেয়ার। চেয়ারের সামনে মেঝেয় একজোড়া শ্রীনিকেতনের ছাপা-চামড়ার চটী পড়িয়া আছে। চটী-জোড়ার একটু উপরে দুইখানি পাতলা গড়নের সুশ্রী পা ঝুলিতেছে এবং ঈষৎ নড়িতেছে। পা দুখানির একটু উপরে একখানি টাঙাইল

সাড়ীর পাড় তেরছা হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। আর একটু উপরে চেয়ারের ডান দিকে একখানি হাত অলসভাবে হাঁটুর উপর পড়িয়া আছে। বাঁ দিকে আর একখানি হাতে একখানি বই খোলা অবস্থায় বুকের উপর ধরা রহিয়াছে। বইখানির নাম আমরা জানি, কিন্তু বলিব না। যিনি পড়িতেছেন, তাঁহার মুখখানি কোমল, স্নিগ্ধ, কমনীয় এবং বুদ্ধি-দীপ্ত।

বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই। একটি ঝি ঘরে ঢুকিয়া এক কাপ চা চেয়ারের নিকটে চৌকির কোণে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু খাবার টাবার আনতে হবে? মিস্ সরকার বলিলেন, না, আমার আজ মোটেই খিদে নেই। মিস্ সরকার ডান হাতে এক এক চুমুক চা খাইতে লাগিলেন, আর এক হাতে বইখানি ধরিয়া পড়িতে লাগিলেন। ঝি-টি চট্‌পট্ ঘরখানি ঝাঁট দিয়া, আলনাখানি একটু গুছাইয়া, কুঁজায় জল ভরিয়া দিয়া প্রায় ছুটিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘরের ভেজান দরজায় একটা নক্ শোনা গেল। মিস্ সরকার তাড়াতাড়ি উঠিয়া বইখানি মুড়িয়া বিছানার উপর শুজনীর তলায় রাখিয়া দিলেন, এবং গায়ের এলোমেলো কাপড় একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলেন, কে? ভিতরে আসুন।

দরজা একটু ঠেলিয়া ভিতরে আসিলেন মিঃ দত্ত। তাঁহাকে দেখিয়াই মিস্ সরকার একটু অপ্রতিভ, একটু বিস্মিত, একটু অবাক হইয়া, নিজেকে সংযত করিয়া একখানি ছোট চেয়ার টানিয়া আনিয়া বলিলেন, বসুন।

মিঃ দত্ত ভবতারিণী বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সেক্রেটারি, সুপুরুষ, বিপত্নীক। ইহার পূর্বে কখনও মিস্ সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে

আসেন নাই, বা কখনও ইঁহার সহিত কোন ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় নাই। তাই আজ ইঁহাকে একেবারে নিজের ঘরের মধ্যে আসিতে দেখিয়া মিস্ সরকার একটু বিব্রত বোধ না করিয়া পারেন নাই।

মিস্ সরকার বলিলেন, আপনি এখন—

ব্যস্ত হবেন না, মিস্ সরকার, আপনি বসুন। আমাকে এখানে আসতে দেখে আপনি বোধ হয় একটু—।

হঁ্যা, আমি স্বীকার কর্‌ছি, একটু আশ্চর্য হয়েছি।

আশ্চর্য একটু হবারই তো কথা। এর আগে আপনার সঙ্গে বেশি আলাপ হবার কোন সুযোগ হয়নি।

উভয়েই অল্পক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে মিঃ দত্ত বলিলেন, আমি এখানে এলুম বলে কি আপনি অসন্তুষ্ট হ'লেন ?

অসন্তুষ্ট হ'ব কেন ? মানে, এতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হবার এমন কি আছে ?

আবার উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব। মিস্ সরকার বলিলেন, আপনি কেন এত সঙ্কোচ বোধ কর্‌ছেন ? কি মনে করে এসেছেন, বলুন না।

না, না, এমন গুরুতর কিছু নয়। আপনি ব্যস্ত হ'বেন না।

আপনি চা খাবেন ?

না, এখুনি খেয়ে এসেছি। তা—হঁ্যা—আপনার কাজকর্ম কেমন চলছে ? আপনার ক্লাসে পড়াশুনায় বেশ ভাল, এমন মেয়ে কজন আছে ?

তা, মন্দ না। সেকেণ্ড ক্লাসে চার পাঁচটা মেয়ে আছে, খুবই ভাল। আমি তো আশা করি, ভবিষ্যতে ওরা খুব ভাল কর্‌বে। এই ত, ওদের খাতা দেখ্‌ছিলাম, চমৎকার লিখেছে।

তা বেশ। ভাল ছাত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

আমাদের কাজে ওইটুকুই তো সান্ত্বনা!

এ কাজ আপনার একঘেয়ে মনে হয় না?

তা মাঝে মাঝে হয় বই কি?

উভয়েই আবার নীরব হইলেন। মিঃ দত্ত ঘরখানির চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। মিস্ সরকার মিঃ দত্তের দৃষ্টি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মিঃ দত্তের দৃষ্টি চারিদিক ঘুরিয়া মিস্ সরকারের কাছে আসিয়া পৌঁছিতেই মিস্ সরকার একটু সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন মিঃ দত্ত বইয়ের শেল্‌ফের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আপনি বুঝি খুব পড়াশুনা করেন?

খুব করি না, তবে অবসর সময়ে একটু আধটু—

আচ্ছা, আমাদের আধুনিক লেখকদের মধ্যে কার লেখা আপনার ভাল লাগে?

আমি খুব ক্রিটিক্যালি পড়ি না। তবে সবাই যাদের লেখা ভাল বলে, তা আমারও ভাল লাগে। আপনার কার লেখা ভাল লাগে?

আমি আধুনিক সাহিত্য বল্‌লে যা বোঝায়, তা পড়িই না। কাজেই—

আপনি বুঝি শুধু খেলা-ধূলা নিয়েই থাকেন? প্রায়ই শুনি, আপনি নানা ক্লাবের নানা রকম কাজে ব্যস্ত থাকেন।

ঠিক বলেছেন। খেলা-ধূলার দিকে আমার বরাবরই খুব ঝোঁক। ঐসব নিয়ে আমার সময় একরকম কেটে যায়। তাছাড়া কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে?

মিস্ সরকারের ঘরের একটা জানালার পাশেই পাশের বাড়ীর একটা জানালা। সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে মিস্ সরকারের প্রায়ই আলাপ হয়। ক্রমশ উহাদের মধ্যে একটা জানালীয় বন্ধুত্ব গড়িয়া

উঠিয়াছে। মিস্ সরকার উঠিয়া গিয়া ওই দিক্‌কার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

মিঃ দত্ত বলিলেন, জানালাটা বন্ধ করলেন কেন?

এম্‌নি।

আজ যেন একটু বেশি গরম পড়েছে, না?

হ্যাঁ। পাখাটা খুলে দিই।

আজ কয়দিনই কেমন যেন একটা গুমোট গরম চলেছে, ঘরে-বাইরে কোথাও সোয়াস্তি নেই।

হ্যাঁ। আপনি বরং এই ডেক-চেয়ারটায় বসুন। চেয়ারটা একটু পাখার দিকে সরিয়ে নিন্।

আপনি?

আমি ঠিক আছি। ব্যস্ত হবেন না। তা—আপনি কি মনে ক'রে এলেন, তা তো বল্‌ছেন না।

এমন কিছু গুরুতর কথা নয়। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

না, না, আমি কেন ব্যস্ত হ'ব। তবে আপনিই বা এত সঙ্কোচ করিছেন কেন?

নাঃ, সঙ্কোচ আর কি? এর আগে শুধু ইস্কুলের কাজকর্ম সম্বন্ধে যা দুই এক দিন দু' চারটা কথা আপনার সঙ্গে হয়েছে। আজই প্রথম আপনার সঙ্গে একটু স্বাভাবিক, একটু সহজ আলাপ হ'লো। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো?

সে কি? বিরক্ত কেন হ'ব। আমি তো প্রায় একা একাই থাকি। আপনার সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে বরং—

আমারও তো সেই কথা। যতক্ষণ কাজকর্ম নিয়ে থাকি, একরকম কাটে, কিন্তু—

আচ্ছা, সেই বিভূতিবাবুর বিধবা স্ত্রী আমাদের স্কুলে দু'হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন, তার কি হ'ল বলুন তো ?

এখনও তো বলছেন, দেবেন। কিন্তু কবে পাওয়া যাবে বলা শক্ত। ওঁর ভাইপোরা নাকি আপত্তি করছে।

আপনি একটু বেশি ক'রে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সত্যি, আমাদের লাইব্রেরীটা বাড়ানো বিশেষ দরকার হ'য়ে পড়েছে।

আর জিমন্যাসিয়ামটাও। মেয়েদের ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতেই হবে।

মেয়েদের বেশি ব্যায়াম করা কি ভাল ?

বেশি না হোক, কিছু কিছু ব্যায়াম বিশেষ দরকার। আমার স্ত্রী— যাক্ গে।

আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য বুঝি খুব খারাপ ছিল ?

ওকথা আর তুলবেন না। আমার ইচ্ছে, মেয়েদের সব আপনার মত স্বাস্থ্য হয়।

মিস্ সরকার একটু লজ্জিত এবং একটু গর্বিত হইয়া ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের প্রতিমূর্তির দিকে একবার চাহিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমাকেই বুঝি আপনার আদর্শ ঠাউরেছেন ?

দোষ কি ?

সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে। ঘরের ভিতরটায় আবছা অন্ধকার। মিস্ সরকার উঠিয়া গিয়া আলো জালিয়া দিলেন। আলো জ্বলিয়া উঠিতেই, উভয়ে একবার উভয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মিঃ দত্ত বলিলেন, আপনাকে অনেকক্ষণ ডিটেন করলুম।

না, না। আপনি বসুন না।

উভয়েই আবার নীরব। মিস্ সরকারের এরূপ অভিজ্ঞতা পূর্বে কখনও হয় নাই। শিক্ষয়িত্রী-সেক্রেটারির সম্বন্ধের সূত্র ধরিয়া কেহ তাঁহার ঘরে আসিয়া এরূপ ঘনিষ্ঠ আলাপ করিতে পারে, তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। অথচ ইঁহাকে সোজাসুজি বা প্রকারান্তরে চলিয়া যাইতে বলিতেও বাধিতেছে। তাছাড়া এমন ক্ষতিই বা কি? একজন ভদ্রলোকের সহিত একটু আলাপ না হয় করিলেনই। মিস্ সরকারের একটু অন্যমনস্কতা মিঃ দত্তও লক্ষ্য করিলেন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, মিস্ সরকার, আপনি বোধ হয় ভাল এস্রাজ বাজাতে পারেন?

হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? দেওয়ালের গায়ে এস্রাজ দেখে বুঝি?

যদি বলি, হ্যাঁ?

ও এস্রাজটা আমার নয়। তবে এস্রাজ বাজাতে আমি পারি একটু একটু, কিন্তু সেটা অন্যকে শোনাবার মত নয়।

একটু শোনান না।

মিস্ সরকার একটু বিপদে পড়িলেন। ব্যাপারটা ক্রমশ এতদূর গড়াইবে, তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। সেক্রেটারির সঙ্গে অভদ্রতা করা সমীচীন নয়। তিনি তো আর রোজ এমন আসেন না, আসবেনও না। তাছাড়া এই নিঃসঙ্গ জীবন, কেউ যদি একটু তাঁর হাতের এস্রাজ বাজনা শুনতে চায়, এমন ক্ষতিই বা কি? অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া আঁচলখানি ডান বাহুর উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া মিস্ সরকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেওয়াল হইতে এস্রাজটি নামাইয়া আনিয়া চৌকির একপাশে বসিলেন। আস্তে আস্তে এস্রাজটি মধুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। একটি গানের সুর শেষ করিয়া মিস্ সরকার

থামিলেন। বলিলেন, আমি ভাল বাজাতে পারি নে, আপনি বল্‌লেন, তাই।

কেন, আপনি তো খাসা বাজান।

মিস্ সরকার এস্রাজটি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। আবার কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। মিঃ দত্ত বলিলেন, আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করলুম।

না, না, বিরক্ত কেন কর্‌বেন।

দেখুন, একটা কথা বল্‌বার জন্য আপনার কাছে আজ এসেছিলাম—

বলুন না।

আমার একটি মেয়ে আছে জানেন—আহা, মা-মরা মেয়েটি—

হ্যাঁ, আমাদের ইস্কুলেই তো পড়ে।

তার মুখের দিকে চেয়েই এতদিন—

মিস্ সরকারের চোখ মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কপালে যেন একটু ঘামও দেখা দিল। মিঃ দত্তের কথা যেন শেষ না হইলেই ভাল হয়! মিস্ সরকার মুখখানি একেবারে নত করিয়া মিঃ দত্তের কথাগুলি নিতান্ত যন্ত্রের মতই শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। কেমন একটা অসহ্য পুলকে হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল।

মিঃ দত্ত বলিলেন, সেই মেয়েটার কথাই আপনাকে বল্‌তে এসেছিলাম। সে এবার অঙ্কে, ইতিহাসে আর ইংরেজিতে ফেল করেছে। হেড্ মিস্ট্রেস্ তাকে কিছুতেই প্রমোশন দিতে চান না। আপনি যদি একটু বলে ক'য়ে—

ওঃ, এই কথা! আচ্ছা, বলে দেখ্‌ব। আচ্ছা, আপনি আসুন তাহলে। আচ্ছা, নমস্কার!

মিঃ দত্ত বাহির হইয়া গেলেন। মিস্ সরকার যেন একটু কাঁপিতে

লাগিলেন। কুঁজার নিকট গিয়া এক গ্লাস জল ভরিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। তারপর যেন দৌড়িয়া গিয়াই গায়ের আঁচল খুলিয়া ফেলিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। খোলা জানালা দিয়া ঝির ঝির করিয়া বাতাস আসিয়া মিস্ সরকারের এলো চুলগুলি সস্নেহে দোলা দিতে লাগিল।

জুলাই, ১৯৪২

হাসি

১

লেকের পাড়ে বসিয়া দুই বন্ধুতে কথা হইতেছে।

রাম বলিল, একটা কাজ করা যাক্।

শ্যাম জিজ্ঞাসা করিল, কি?

একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করা যাক্।

বাজারে কাগজের কি অন্ত আছে? তার পরে আবার কাগজ?

তা হোক্, একখানা নূতন ধরণের সাপ্তাহিক, যেমন ধর 'বিচিত্র ভারত'।

ওরকম কাগজ তো রয়েছেই, আর একখানা বের ক'রে লাভ কি?

আমি কি আর কাগজ বের ক'রতে চাই লাভ করবার জন্য? একটু নির্দোষ আমোদ, অন্যকে একটু আনন্দ দেওয়া, এই আর কি!

তুমি বাপু সব পার। বাবার টাকা আছে, এমনি করে ওড়াও।

না, না। তুমি দেখ, দু' চার মাস পরেই কাগজ দাঁড়িয়ে যাবে। লাভ না হোক্, লোকসান হবে না।

নেহাত ঝোঁক হয়েছে, দেখ চেষ্টা ক'রে। আমার কিন্তু মন এগোচ্ছে না।

আরম্ভ করলেই মন এগোবে। বিলেতের "পাঞ্চ্" ধরণের একখানা কাগজ বের ক'রতে হবে। বাংলার সাময়িক সাহিত্যজগতে একটা যুগান্তর আনতে হবে।

দেখো, যেন যুগান্ত আনতে গিয়ে প্রাণান্ত না হয়!

কি যে বল !

নেহাৎ মন্দ বল্‌ছি নে। 'পাঞ্চ'-এর স্যাটায়ার সবাই সইতে পারবে তো? শেষে একটা অনর্থ না হয়!

কুছ পরোয়া নেই!

রাম মনে মনে তাল ঠুকিল, শ্যাম চিন্তিত হইল।

২

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সাপ্তাহিক 'হাসি' বাহির হইয়াছে। সম্পাদক—শ্রীরামচন্দ্র; পরিচালক—শ্রীশ্যামসুন্দর।

কাগজ পড়িয়া বাংলার পাঠকসমাজ কেহ পুলকিত, কেহ বিস্মিত, কেহ স্তম্ভিত, কেহ রোমাঞ্চিত, আবার কেহ কেহ শুধু আনন্দিত হইতেছেন। চিরাচরিত প্রথানুসারে একখণ্ড কাগজ সম্পাদকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া নগরের প্রায় অর্ধেক ব্যক্তি বিনামূল্যে পুলকসংগ্রহ করিতেছেন। তথাপি কাগজ চলিতেছে। শ্রীরামচন্দ্রের পিতার পরিত্যক্ত অর্থ কিছু কিছু ব্যয়িত হইলেও কাগজখানির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্যামসুন্দর ব্যতীত আর সকলেরই মনে একটা আশা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমশ অনেকেরই পকেটে একখানি করিয়া 'হাসি' দেখা দিতে লাগিল। ইস্কুলে, কলেজে, ক্লাবে, এমন কি ট্রামে বাসেও অনেকেরই হাতে এবং মুখে 'হাসি' দেখা যাইতে লাগিল। অদ্ভুত ব্যাপার! ট্রাম ও বাসের স্বাভাবিক কাঁদ-কাঁদ মুখগুলি অকস্মাৎ অস্বাভাবিক হাসি-হাসি হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধেরা মৃদু হাসিলেন, প্রবীণেরা উৎফুল্ল হইলেন, যুবকেরা পুলকিত

হইলেন, যুবতীরা মুগ্ধ হইলেন, কিশোর-কিশোরীরা আহ্লাদিত হইলেন।

রামচন্দ্র নাচিতে লাগিলেন, শ্যামসুন্দর ভাবিতে লাগিলেন।

৩

দিন যায়। একদিন প্রাতে শ্যাম 'হাসি'-অফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। শ্যাম-পত্নী আসিয়া বলিলেন, সর্বনাশ হয়েছে!

ব্যাপার কি ?

নিজেই পড়ে দেখ—বলিয়া শ্যাম-পত্নী একখানি দৈনিকের একটি স্থান শ্যামের চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিলেন। শ্যাম মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সংবাদটি এই—

"গত কল্য ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে কে বা কাহারা 'হাসি'-সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্রকে পশ্চাদ্দিক হইতে অলক্ষ্যে সাংঘাতিকভাবে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র হাসপাতালে। অবস্থা উদ্বেগজনক।"

এমনি একটা ব্যাপার শ্যাম বহুপূর্বেই আশঙ্কা করিয়াছিল। শ্যাম ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল অনুসন্ধান করিতে। প্রথমে হাসপাতাল, তারপর থানা। অনেক কষ্টে আসামীকে নাকি পাওয়া গিয়াছে। একটা পানওয়ালা নাকি তাহাকে পিছন হইতে তাড়া করিয়া ক্রমশ অন্য লোকজন একত্র করিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। এই গুণ্ডাটির নাম গঙ্গাদীন। যথাসময়ে বিচারালয়ে গিয়া বিচারককে বলিল, আমি অপরাধ স্বীকার কর্‌ছি। কিন্তু আমার এরূপ ব্যবহারের সঙ্গত কারণ ছিল।

সঙ্গত কারণ ? বুঝাইয়া বল।

হ্যাঁ। রামবাবুর 'হাসি' বলে একখানা কাগজ আছে। তাতে আমাকে ক্যারিকেচার করা হয়েছে।

বিচারক 'হাসি'র নিয়মিত পাঠক। তিনি বলিলেন, আমি তো 'হাসি' পড়ে থাকি। কোন সংখ্যায় কোথায় তোমাকে ক্যারিকেচার করা হয়েছে? গঙ্গাদীন 'হাসি'র সংখ্যা এবং পৃষ্ঠার উল্লেখ করিল। বিচারক তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া নিজের বাসা হইতে 'হাসি'র উক্ত সংখ্যা আনাইয়া আসামীর নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা বাহির করিলেন। বলিলেন, এই যে, এই পৃষ্ঠায় একটা মোটা লোকের ছবি আছে বটে, কিন্তু এর সঙ্গে তোমার সাদৃশ্য কোথায়? আমি তো একটুও মিল দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। মুখ, হাত, পা, মাথা, কোথাও কোন সাদৃশ্য নেই।

আজ্ঞে, শার্টটা লক্ষ্য করেছেন? ঠিক আমার মত।

তাতেই তোমাকে ক্যারিকেচার করা হ'ল? আর সেইজন্য 'হাসি'র সম্পাদককে তুমি খুন কর্‌তে যাচ্ছিলে? কি ভয়ানক! তুমি 'হাসি' পড়ে থাক?

আমি ওসব হাসি টাসির ধার ধারিনে। আমার কাজই বলুন, হবি-ই বলুন, রি-ক্রিয়েশনই বলুন, পাস্‌টাইমই বলুন, আর স্বভাবই বলুন, কারো 'পরে কোন কারণে বা অকারণে অসন্তুষ্ট হ'লেই অন্ধকারে পেছন থেকে তাকে ছুরি মারা।

এ তো ভয়ানক কথা! যাক্, তুমি যে সরলভাবে নিজের দোষ আর স্বভাব স্বীকার করেছ, এটাও মন্দের ভাল। তোমার শাস্তি হ'ল এই যে তুমি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ কর্‌বে। প্রত্যেক দিন সকালে এবং বৈকালে দুই গ্লাস করে রসগোল্লার রস খাবে। আমি প্রবীণ ময়রাকে অর্ডার দিচ্ছি, রোজ দুবেলা টাট্‌কা রসগোল্লার রস তোমাকে পাঠিয়ে দেবে। প্রতি সপ্তাহে একখানি ক'রে 'হাসি' তুমি পড়বে। 'হাসি' পড়ে যতদিন না তোমার হাসি পায়, ততদিন এই ব্যবস্থা। যখন দেখা যাবে, তুমি 'হাসি' পড়ে হেসে লুটিয়ে

পড়ছ, তখন তুমি খালাস পাবে। তার আগে নয়। সিপাহি, যাও, আসামীকে নিয়ে যাও।

৪

হাসপাতালে শ্রীরামচন্দ্র ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন। একটা ফুস্‌ফুস্‌ ফুটা হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছে, প্রাণের ভয় নাই। জেলে গঙ্গাদীন রসগোল্লার রস নিয়মিত পান করিয়া রসিক হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে একখানি 'হাসি' পড়িয়া হাসিবার চেষ্টা করিতেছেন।

জুলাই, ১৯৪২

বিমলা

১

রাজপুরের জমীদার গজানন হালদার বার মাস কলিকাতায় থাকেন। সম্প্রতি দেশে আসিয়াছেন, অল্পদিনের জন্য। সঙ্গে বন্ধুবান্ধবও আসিয়াছে জনকয়েক।

রাজপুরের পাশ দিয়া বহিয়া গিয়াছে 'রেখা'। নদীটি ছোট কিন্তু প্রাকৃতিক শোভায় পরিপূর্ণ। নীলজলের ছোট স্রোতটি আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই পাশে কোথাও ঘন বাঁশের বন, কোথাও সুপারি-নারিকেলের বাগান, কোথাও বিস্তৃত আমগাছের সারি, কোথাও সুবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, আবার কোথাও ছোট বড় নানা আকারের ঘরবাড়ী। নদীটির দুই পাশে কিছুদূর পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যায়, এ অঞ্চলটা মোটের উপর বেশ সমৃদ্ধিশালী। এই নদীর একটি ক্ষুদ্র বাঁকের উপর রাজপুর গ্রাম। গ্রামের প্রায় মাঝখানে জমীদার-বাড়ি। চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সদর গেটের মধ্যে ঢুকিলেই প্রথমে দেখা যায় মস্ত সাজানো বাগান। বাগানের মধ্যে একটি প্রশস্ত পথ। পথ শেষ হইয়াছে প্রকাণ্ড তিন সারি সিঁড়ির নীচে। সিঁড়ির উপরে বারান্দা। বারান্দার দুই পাশ দিয়া দুইটি সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়া গিয়াছে। দোতলার দুইটি অংশকে মোটামুটি মেয়েমহল এবং পুরুষমহল বলা যাইতে পারে। এই বাড়ীর পিছন দিকে একটি সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে ভিতরের উঠানে। উঠানের চারিপাশ ঘিরিয়া একতলা দালান। এই দালানেও অনেকগুলি ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, গুদাম ঘর, ঠাকুরঘর, চাকরদের ঘর ইত্যাদি।

গজানন বাবুর অবস্থান সর্বদাই দোতলার পুরুষমহলে। পুরুষ ও মেয়ে, দুইটি মহলই বেশ ভাল করিয়াই সাজানো গুছানো। এই দুই মহলের মধ্যে যাতায়াতের অনেকগুলি পথ থাকিলেও, পথগুলি বড় একটা ব্যবহৃত হয় না, ভিতরের দিককার দরজাগুলি প্রায় বন্ধই থাকে। নীচের তলায় একপাশে অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার মহাশয়ের ঘর। অন্য ঘরগুলিতে অন্যান্য কর্মচারীরা থাকেন। ম্যানেজার মহাশয় থাকেন পৃথক্ বাড়ীতে।

প্রাতে এক আধ ঘণ্টা কর্মচারীদিগের সহিত বৈষয়িক কথাবার্তা বলা ব্যতীত বর্তমানে গজানন বাবুর অন্য কোন কাজ নাই। সমস্ত দিন তাস পাশা দাবা প্রভৃতি চলে। কোন কোন দিন টেনিস খেলা, পাখী শিকার, মাছ ধরা, এসবও হয়। আবার এক এক দিন বজরায় উঠিয়া রেখা নদীতে সান্ধ্যভ্রমণও হইয়া থাকে।

২

সেদিন শুক্লা ত্রয়োদশী। গজাননবাবু বলিলেন, আজ একটু লম্বা পাড়ি দেওয়া যাক। বেলা দুটার সময়েই বাহির হইয়া পড়িলেন। বজরাখানি হেলিয়া দুলিয়া রেখার নীলস্রোতে ভাসিয়া চলিল। এক বন্ধু গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিলেন, একজন সিগারেটের টিন লইয়া পড়িলেন, একজন একটি ছোট বাঁশী বাহির করিয়া তাহাতে স্বরযোজনা করিতে লাগিলেন। অপর সকলে, কেহ ভিতরে, কেহ বাহিরে, কেহ ছাদের উপরে শয়ান এবং অর্ধশয়ান হইয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

গজানন ছাদের উপরে। কখনো শয়ন, কখনো উপবেশন

করিতেছেন। বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিতেছে। গজানন বলিলেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা যাব দিনের আলোয়, তারপর আমরা ফিরব চাঁদের আলোয় কেমন? সকলেই বলিলেন, বেশ, তাই হবে।

চারিদিকে চাহিতে চাহিতে গজাননের দৃষ্টি একস্থানে আসিয়া থামিয়া গেল। ছোট একটি ঘাট। খেজুরের গাছ কাটিয়া টুকরা করিয়া এক এক খণ্ড দ্বারা এক একটি সিড়ির ধাপ প্রস্তুত করা হইয়াছে। দুই পাশে পর পর কতকগুলি বাঁশের খুঁটি দ্বারা সেই ধাপগুলি আটকান। যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহাদের পক্ষে এইরূপ সিঁড়ি দিয়া ওঠা নামা খুবই কষ্টকর। কিন্তু পল্লীগ্রামের অভ্যস্ত নরনারীর পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক এবং সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ঘাটটির নীচের ধাপে একটি অনূঢ়া তরুণী বসিয়া গাত্রমার্জনা করিতেছে। পাশেই জলের কলসী, কলসীর মুখে একখানি কাপড়। তরুণীটি সত্যই সুন্দরী। গজানন পকেট হইতে বাইনোকুলার বাহির করিয়া আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। মাঝিকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, মাঝি, ঐ ঘাটে বজরা ভিড়াও। সঙ্গীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ও কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে বজরাখানি নানা সুরের ও নানা ভঙ্গীর কথাবার্তায় মুখর হইয়া উঠিল। গজানন একটু ধমকের সুরেই বলিয়া উঠিলেন, তোমরা একটু থাম।

এদিকে তরুণীটি বজরাখানিকে ঘাটের দিকে আসিতে দেখিয়া প্রথমে কৌতূহলী পরে বিস্মিত হইল। আরো কাছে আসিতেই একটু ভীত, একটু সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি গায়ের ভিজা কাপড় সংবৃত করিয়া কলসীতে জল ভরিয়া সিঁড়ির ধাপ বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বজরাখানিও ঘাটে আসিয়া পৌছিয়াছে। গজানন একজন দাঁড়ীকে হুকুম দিলেন, শীঘ্র যাও, ঐ মেয়েটির পেছনে পেছনে। ওর

বাড়ী গিয়ে একটা দেশলাই, বা মুড়ি, বা দুধ, যাহোক একটা কিছু চেয়ে নিয়ে এস, বুঝ্লে? বুঝেছ?

যে আজ্ঞে—বলিয়াই সে ঘাটের উপরে লাফাইয়া পড়িল। জমীদারের বজরার মাঝি, জমীদারের হুকুমের অর্থ বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইবার কথা নহে।

মেয়েটি যথাসম্ভব শীঘ্র ঘাটের উপরে উঠিয়া ত্রস্তপদে গ্রামের ভিতরে চলিতে লাগিল। পশ্চাতে গজাননের চর তাহাকে অনুসরণ করিল। কিছুদূর গিয়াই একটি ছোট বাড়ী। দুই পোতায় দুইখানি ঘর, একখানি টিনের, আর একখানি খড়ের। আর এক পোতায় একখানি ছোট লম্বা নীচু ঘর। তাহার একপাশে রান্না হয়, অপর পাশে বাঁশ, খড়, কাঠ প্রভৃতি থাকে। বিমলা খড়ের ঘরের দাওয়ায় কলসীটি নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া বারান্দায় আসিতেই দেখে, বজরার সেই মাঝিটি উঠানে দাঁড়াইয়া। তাহাকে দেখিয়াই চকিতা হরিণীর মত বিমলা ঘরের মধ্যে চলিয়া গিয়া ডাকিল, বাবা!

টিনের ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, ঈশান চক্রবর্তী। বৃদ্ধ একহাতে হুঁকা, আর এক হাতে কোঁচার খুঁট ধরিয়া উঠানে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিমু, মা, অমন করে আমাকে ডেকে উঠ্লি কেন? বিমলা ঘর হইতেই বলিল, উঠানে কে, দেখ; কি চায়, জিজ্ঞাসা কর।

ঈশান ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাও বাপু?

আজ্ঞে, আমাদের জমীদার বাবু বজরায় বেড়াতে বেরিয়েছেন। তা আমরা, মানে, আমরা দেশলাই আন্তে ভুলে গেছি। একটা দেশলাই দেবেন।

দেখি বাপু! যা দর আজকাল দেশলাইয়ের।

তার জন্য আর কি! আমাদের বাবু একটা দেশলাইয়ের জন্য দশ টাকা, বিশ টাকা, চাই কি হাজার টাকাও দিতে পারেন।

তা তো পারেনই। তা তো পারেনই।

বিমলা ঘরের ভিতর হইতে একটি আধ-ভরা দেশলাই উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

দেশলাইটি হাতে লইয়া মাঝি ঈশান ঠাকুরকে বলিল, ঠাকুর তোমার বরাত ভাল। তারপর তাঁহাকে একটু একান্তে ডাকিয়া লইয়া কি যেন বলিতেই ঠাকুর মহাশয় পা হইতে খড়ম খুলিয়া চর মহাশয়ের মাথার খুলিতে বসাইয়া দিলেন। মাঝি 'আচ্ছা!' বলিয়া বজরায় ফিরিয়া গেল।

ব্যাধভীত হরিণের মত পিতাপুত্রী কাঁপিতে লাগিলেন। মাতৃহীনা তরুণী কন্যাকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া ঈশান ঠাকুর সাশ্রুনয়নে দুর্গানাম জপিতে লাগিলেন।

৩

সন্ধ্যার পর পাড়ার রবীন আসিয়া ডাকিল, জ্যাঠামশায়!

ঈশান ঠাকুর বলিলেন, কে, রবীন, আয়।

রবীন ঘরের বারান্দায় উঠিয়া বলিল, বিমু কই?

ওই তো ঘরে, শুয়ে আছে।

শুয়ে? অসুখ বিসুখ করে নি তো?

না।—বলিয়া ঈশান ঠাকুর বৈকালের সব ঘটনা বিবৃত করিলেন। রবীন বলিল, আমিও তো সেইজন্যই এসেছি। সন্ধ্যার সময়ে ঘাটের দিকে গিয়েছিলাম। বজরা দেখে এগিয়ে গেলাম। বজরার উপরে খুব তর্কবিতর্ক চলছিল। বিমুর কথা শুনেই একটু কাণ পেতে

রইলাম। যা শুন্‌লাম, সে তো ভয়ানক কথা। থানা তো এখান থেকে চার ক্রোশ। তাছাড়া জমীদারের বিরুদ্ধে এসব থানায় গিয়ে কোন লাভ নেই। পাড়ায় দুএকটা বাড়ীতে বিমুকে লুকিয়ে রাখবার কথা আমি প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু কেউ সাহস পায় না।

তাহলে উপায় ?

উপায় একটা করতেই হবে। ওরা তো আজই দুপুর রাত্রে আস্‌বে এই রকম ষড়যন্ত্র করেছে। একটা কাজ করা যাক। আমাদের ওই নবীন জেলের ডিঙ্গিটায় করে বিমিকে বড়পিসীর বাড়ী হাঁসখালিতে রেখে আসি। হ্যাঁ, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই। আপনারা প্রস্তুত হন। আমি ডিঙ্গি আর লোক জোগাড় করে এক ঘণ্টার মধ্যেই ফির্‌ব।

রবীন চলিয়া গেল। বিমলা তাড়াতাড়ি একটি ছোট পুঁটুলিতে তাহার সামান্য কাপড় জামা গুছাইয়া লইল। নীচু ঘরের একপাশে ঘুঁট খেলিবার জন্য অনেকগুলি করবীফুলের বীচি জড় করা ছিল। তাহারই কতকগুলি নোড়া দিয়া ভাঙিয়া তাহার ভিতরের শাঁস খানিকটা একত্র করিয়া কোমরের কাপড়ের খুঁটে গুঁজিয়া রাখিল। ঈশান ঠাকুর ধরা গলার বলিলেন, কিছু খেয়ে নে মা। একেবারে অভুক্ত যাবি বাড়ী থেকে ? বিমলা বলিল, না, বাবা, এখন কিছু খাব না, আমার খিদে নেই। তুমি আমার জন্য ভেবো না। ভগবান্‌ আমাদের বাঁচাবেন।

রবীন আসিয়াই বলিল, শিগ্‌গির !

বিমলা পিতার পায়ের ধূলি লইয়া পুঁটুলি বগলে করিয়া রবীনের সঙ্গে ডিঙিতে উঠিল। একাদশীর চাঁদ পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে। সপ্তদশী বিমলার করুণ, স্নিগ্ধ, কমনীয় মুখখানি দুশ্চিন্তায় ও আতঙ্কে

পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে। রবীন এবং আরো কয়েকটি যুবকের অক্লান্ত বাহুবলে ডিঙিখানি তীরবেগে হাঁসখালি অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

৪

চরের মুখে সংবাদ শুনিয়া গজানন গজ গজ করিতে করিতে হুকুম করিলেন, বজরা ফিরাও। দুঘণ্টার মধ্যে বজরা রাজপুরের ঘাটে পৌছান চাই। নইলে বেত মেরে—

বজরা ফিরিল। ঘর্মাক্ত মাঝিরা ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে একাদশীর চাঁদ ভাসিতে লাগিল।

গজানন বাড়ী ফিরিলেন। বিশ্বস্ত দুই একজন কর্মচারী ও ভৃত্য লইয়া গোপন বৈঠক বসিল। ধর্মদাস মাঝির লম্বা ডিঙি এবং পঞ্চাশ জন জোয়ান মাঝির ব্যবস্থা হইল। তিনটি বর্শারও বরাদ্দ হইল। প্রত্যেকের হাতে একখানি করিয়া একশত টাকার নোট গুজিয়া দেওয়া হইল। অভিযান সফল হইলে আরো দুইখানা করিয়া পাইবে।

পঞ্চাশখানি বৈঠার সাহায্যে নৌকাখানি জলের উপর দিয়া উড়িয়া চলিতে লাগিল। বিমলাদের ঘাটে পৌছিয়া ঘাটের নিকটের এক বাড়ী হইতে উহাদের পলায়নের সংবাদ পাইয়াই ইহারা হাঁসখালি অভিমুখে ছুটিল। কিছুক্ষণ পরেই ইহারা বিমলার নৌকার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঝি হাঁকিল, নৌকা থামাও! রবীনের সঙ্গীরা একথায় কর্ণপাত না করিয়া যথাসাধ্য বাহিয়াই চলিল। পরক্ষণেই একটি বর্শা আসিয়া বিঁধিল, রবীনের সম্মুখে এবং বিমলার পায়ের কাছে, নৌকার পাশে। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে দেখিয়া অগত্যা ইহারা থামিল। জমীদারের ডিঙি পাশে আসিয়া ভিড়িল। ডিঙি হইতে একজন বিমলার হাত ধরিতে যাইতেই বিমলা সজোরে বলিয়া উঠিল, আমাকে ছুঁয়ো না।

চল, আমি যাচ্ছি। রবীন বলিল, সে হবে না। প্রাণ থাকতে আমরা তোমায় ছেড়ে দেবো না। বিমলা বলিল, রবীনদা, এ ডাকাতদের সঙ্গে তোমরা পারবে না। তারপর তাহার সঙ্গীদের লক্ষ্য করিয়া বিমলা বলিল, তোমাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ। এতখানি কষ্ট তোমরা আমার জন্য করলে! আমার বলবার আর কি আছে? বাবাকে সান্ত্বনা দিও।

বিমলা জমীদারের ডিঙিতে আসিয়া বসিল। আঁচলখানি কোমরে শক্ত করিয়া জড়ানো। বাঁদিকে পুঁটুলিটি রাখিয়া স্থির হইয়া বসিয়া মাঝিদিগকে বলিল, চল, কোথায় যাবে চল।

মাঝিদের মধ্যে একজন বলিল, এ বড় শক্ত মেয়ে দেখ্‌ছি। সাবধান, যেন জলে না ঝাঁপ দেয়।

আর একজন মাঝি বলিল, ত্যাখ, মান রেখে কথা বলিস। আমরা না হয় আজ জমীদারের কুকুর। ও যদি আমার মেয়ে হ'ত।

সমস্ত ডিঙি নীরব ও নিস্তব্ধ। একাদশীর চাঁদ প্রায় অস্ত গিয়াছে। রেখার নীল জলে ছপ্‌ছপ্‌ বৈঠার শব্দ, এবং কদাচিৎ নদীর পাড়ে মৃদু বায়ুতাড়িত গাছের পাতার ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ ব্যতীত কোথাও কোন শব্দ নাই। অতি নীরবে, অতি সন্তর্পণে, ডিঙি আসিয়া রাজপুরের জমীদারদের ঘাটে ভিড়িল।

৫

দোতলার পুরুষমহলে অনেকগুলি ঘর। তাহারই একটি ঘরে বিমলাকে আনিয়া রাখা হইয়াছে। ঘরখানি বাড়ীর ভিতরের দিকে। জানালা দিয়া ভিতরের উঠান দেখা যায়। ঘরের আসবাবপত্র আধুনিক রুচিসঙ্গত এবং বাহুল্যবর্জিত। একখানি খাট, একটি ড্রেসিং-টেবিল,

একটি ডোয়ার্ফ-আলমারি, একটি আলনা, একখানি ছোট গদি-আঁটা চেয়ার এবং একখানি সোফা। ড্রেসিংটেবিলের একপাশে একটি বড় কেরোসিনের টেব্‌ল্‌-ল্যাম্প জ্বালা রহিয়াছে।

বিমলা ঘরে আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া কেমন হতভম্ব হইয়া গেল। এরূপ সাজানো ঘরে জীবনে কখনো সে পদার্পণ করে নাই। বহুদিন পূর্বে একবার মামার সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিল। তখন পাড়া-পড়শীর বাড়ীর জানালা দিয়া অনেক সময় এইরূপ সাজানো ঘর দেখিয়াছে দু একবার, কিন্তু এমন বাস্তব হইয়া তাহা উহার পায়ের তলায় আসিয়া পৌছে নাই। সমস্ত শরীরটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়াই সে সোফাখানির একপাশে বসিয়া হেলিয়া পড়িল।

একটু পরেই একটি ঝি এই ঘরে ঢুকিল, হাতে একখানি থালা, খাবারে ভরা। বলিল, একটু খাবার খেয়ে নেও।

বিমলার বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। ধড় মড় করিয়া উঠিয়া ঝি-টির দিকে তাকাইয়া, হাতে খাবারের থালা দেখিয়া বলিল, আমি কিছু খাব না, আমার খিদে পায় নি।

উপোষ করে লাভ কি দিদি? যার যা কপালে থাকে—

থাক্, তুমি যাও। আমি কিছু খাব না।

বিমলা বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। কোমরে হাত দিয়া দেখিল, ছোট্ট মোড়কটি ঠিক আছে। একবার ভাবিল, এখনই খেয়ে ফেলি; আবার ভাবিল, কাল খাইলেই হইবে। মোট কথা সমস্ত দিনের অনাহার, উদ্বেগ, আশঙ্কায় মনটা একেবারে যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে, কিছুই ভাবিবার ক্ষমতা নাই।

একটু পরে ঝিটি আবার আসিয়াছে। এবার তাহার হাতে খান-

কয়েক জামা-কাপড়। সিল্কের আধুনিক ডিজাইনের শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া। ঝি বলিল, লক্ষ্মীটি, এইগুলি পরে নেও।

চলে যাও আমার সামনে থেকে।

লক্ষ্মী দিদিমণি, তুমি কিছু খেলে না ব'লে বাবু আমার পরে কত রাগ করছেন। এ কাপড়-চোপড় নিয়ে ফিরে গেলে আমাকে আস্ত রাখবেন না। লক্ষ্মী, দিদিমণি—

আবার!

কি করব বল? আমার কি কোন জোর আছে, না হাত আছে?

আচ্ছা। রেখে যাও ওগুলো ওই খাটের পাশে।

তাই যাচ্ছি। বাবু কিন্তু বলেছিলেন, আমাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে। একটু পরে তিনি নিজেই আসবেন।

নিজেই আসবেন!—বিমলার বুকখানা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, আচ্ছা, তুমি যাও এখান থেকে।

তবে যাচ্ছি। দেখ, ওদিকে ওই যে একটা ছোট দরজা, ওটা খুললেই কলঘর পাবে। ওখানে জলটল আছে।

ঝি চলিয়া গেল। বিমলার মন চঞ্চল ও কঠিন হইয়া উঠিল। মনটাকে ঘুমাইতে দিলে আর চলে না।

বিমলা কাপড় জামা ছাড়িল। সাজিয়া গুজিয়া ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় টেব্‌ল্‌-ল্যাম্পের আলোয় নিজেকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। নিজের এই অপরূপ রূপ সে তো কখনো দেখে নাই। ছাড়া কাপড়ের খুঁট হইতে ছোট মোড়কটি পুনরায় কোমরে গুজিয়া রাখিল। একবার, দুইবার, বহুবার সে নিজেকে দেখিল। একবার একটু বুঝি মুচকি হাসিল, পরক্ষণেই চোখের কোণে দুইটি অশ্রুবিন্দু মুক্তার মত চক চক করিয়া উঠিল। বাবার কথা মনে হইতেই আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিয়া

ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু ক্ষণেকের জন্য। সাজগোজ শেষ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া একটা এলোখোঁপা বাঁধিয়া, আঁচলটি ঘুরাইয়া ডান বাহুর উপরে আনিয়া আস্তে আস্তে পাশের স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল।

৬

জমিদার-গৃহিণী আরতি দেবী নিঃসন্তান। বয়স কিছু হইয়াছে, কিন্তু যৌবন-সুলভ চাঞ্চল্য ও কমনীয়তা এখনও সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া আছে। স্বামী যখন কলিকাতায় থাকেন, তখন ইনিও কলিকাতায় থাকেন। স্বামী যখন দেশে আসেন, তখন ইনিও দেশে আসেন। কিছুদিন হইতে ইহাঁদের মনের ব্যবধান ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। গজানন যতই পুরুষমহল এবং তাস, পাশা, শিকার, ফটোগ্রাফি প্রভৃতির মাত্রা বাড়াইতেছেন, আরতি বেদীও পড়াশুনা দান, ধ্যান, পূজা অর্চনার মাত্রা ক্রমশ বাড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রতি বিষয়েরই একটা সীমা আছে। তাঁহাদের এই ব্যবধানের মাত্রা বোধ হয় সীমা ছাড়াইবার উপক্রম করিয়াছে।

জমিদার-বাড়ীর লোকজনের মুখে, বিশেষ ঝির মুখে, বিমলার আগমন-বার্তা আরতির কাণে পৌঁছিয়াছে। শুনিয়া অবধি আরতি দেবীর সমস্ত শরীর মন একটা অসহ্য বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। একবার মনে করিলেন, গজাননকে ডাকিয়া সোজাসুজি একটা বোঝাপড়া করা যাক। কিন্তু সাহস হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না। বহুদিনের সঞ্চিত গ্লানি আজ মনের পাত্র ভরিয়া ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যে বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনি নিজে, তাঁহারই সেই মন্দিরে এই কালিমাসঞ্চার তাঁহার

অন্তরাত্মাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার নিজের জীবনের, নিজের অস্তিত্বের আজ কোন সার্থকতাই খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কি করিবেন, কি করা উচিত, কি বলা উচিত, কোথায় থাকা উচিত, প্রভৃতি নানাপ্রকার সূত্রহীন, শৃঙ্খলাহীন চিন্তায় মনটা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

একবার ভাবিতেছেন, এ পাপপুরী পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু দুরন্ত অভিমান তাহাকে যাইতে বারণ করে। যেখানে তাঁহার অধিকার, যেখানে তাঁহার রাজত্ব, তাহা ছাড়িয়া ভিখারিণীর মত পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে তাহার বড়ই বাধিতেছে। পিত্রালয়ের লোকের কাছে এ মুখ দেখানর চেয়ে মরণই শ্রেয়। আবার ভাবিতেছেন অর্থের তো তেমন অভাব কিছু নাই। একেবারে দেশান্তরী হওয়া মন্দ কি? নবদ্বীপ বা কাশী বা বৃন্দাবন, কোথাও একটা মোটামুটি আশ্রয় কি মিলিবে না? কোনমতে দিনগুলি কাটিয়া গেলেই হইল। কিন্তু তাহাতেই কি শান্তি পাইবেন? সীমন্তের সিন্দুর কি সেখানেও লোকদৃষ্টি টানিয়া আনিবে না? সেখানেও কি স্বামী-পরিত্যক্তার ব্যর্থ জীবনের কালিমা মন হইতে ধুইয়া ফেলিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না?

কত কি ভাবিতেছেন! যেদিন এই জমিদার বাড়ীতে প্রথম আসেন, সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত, কত স্মৃতি, কত ঘটনা তাঁহার মনে ভিড় করিয়া আসিতেছে: ভাবিয়া ভাবিয়া শুধু তাঁহার মনের ভার বাড়িয়াই চলিয়াছে। সহসা একবার মনে হইল, মেয়েটিব সঙ্গে একবার দেখা করা যাক। কিন্তু সোজাসুজি তাহার কাছে যাওয়া বা তাহাকে ডাকিয়া আনা, কোনটাই সম্ভব বা সমীচীন মনে হইল না।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া বসিয়া ভাবিলেন। পরে ঝির নিকট

বিমলার সংবাদ লইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সংকল্প করিলেন।

দোতলার পুরুষমহলে এবং মেয়েমহলের মাঝে তিনটি স্নানের ঘর। তাহার মধ্যে দুইটির দুইদিকেই দরজা আছে। তবে সাধারণত মেয়েদের দিকের দরজা বন্ধই থাকে। কারণ, মেয়েরা বিশেষ প্রয়োজন না হইলে এদিকে বড় একটা আসেন না। ইহারই একটি স্নানাগারে বিমলার আসিবার সংবাদ পাইয়া, আরতি দেবী নিঃশব্দে পিছনের দরজার নিকট গিয়া মৃদু করাঘাত করিলেন।

বিমলা প্রথমে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সাহসে ভর করিয়া আস্তে দরজা খুলিতেই, আরতি দেবী ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বিমলা বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে আরতি দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আরতি দেবী বলিলেন, ভয় নেই। আমি—

বুঝেছি। আপনিই এ বাড়ীর কর্ত্রী।

কর্ত্রী! হ্যাঁ, কর্ত্রী।

আমাকে বাঁচান।

সে সাধ্য আমার নেই। তা যদি থাকতো, তাহলে এতক্ষণ তোমার অনুরোধের অপেক্ষায় আমি থাকতুম না।

তাহলে, আমি যা সঙ্কল্প করেছি, তাই হোক।

কি সঙ্কল্প করেছ?

আমি এখনই মরব।

কেমন করে মরবে?

সে ব্যবস্থা আমার সঙ্গেই আছে।—বলিয়া বিমলা তাহার কোমর হইতে একটি মোড়ক বাহির করিয়া আরতি দেবীকে দেখাইল।

সহসা আরতি দেবী বলিয়া উঠিলেন, ভাই, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

সে কি?

হ্যাঁ, আমার বেঁচে থাকবার কোন মানে নেই। তুমি আর তর্ক করো না। সময়ও বেশি নেই।

পরস্পরকে তাঁহারা নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। পরে উভয়েই বিমলার মোড়কটিকে নিঃশেষে গলাধঃকরণ করিয়া, মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন। বিমলা একটু সরিয়া গিয়া দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া পা ছড়াইয়া বসিল এবং আরতি দেবীকে টানিয়া নিজের কোলের উপর শোয়াইয়া তাহার চুলগুলি নাড়িতে লাগিল।

৭

গজানন বিমলার ঘরে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ঝির নিকট বিমলার সংবাদ লইয়া সোফার উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর ঝিটিকে পুনরায় ডাকিয়া স্নানঘরের দরজা খুলিতে বলিলেন। ঝির চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

এদিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। পূর্বাকাশে আলো দেখা দিয়াছে। গজানন প্রথমে রুষ্ট, পরে বিরক্ত এবং তৎপরে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আর একটু পরে ব্যাপারটিকে আর গোপন রাখা চলিল না। লোকজন আসিয়া স্নানঘরের দরজা ভাঙিয়া ফেলিল। ঘরের মধ্যে যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহাতে জমীদার বাড়ীর সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ব্যাপারটা ক্রমশ রাজপুর এবং রাজপুরের নিকটবর্তী সকল গ্রামেই জানাজানি হইয়া গেল। দলে দলে লোক ছুটিল জমীদার বাড়ীর

দিকে। যথাসময়ে মহা সমারোহের সহিত বিমলা ও আরতি দেবীকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। একই চিতায় উভয়ের দেহ ভস্মীভূত হইল।

কয়েকদিন গজানন প্রায় অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইলেন। সমস্ত মন একটা শূন্যতা, একটা গ্লানি, একটা অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। ক্রমাগতই মনে হইতে লাগিল, তাঁহার জীবনটা ব্যর্থ, তাঁহার জমিদারী ব্যর্থ, তাঁহার সংসার ব্যর্থ। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সঙ্গীদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

এক মাস পরে একদিন ম্যানেজারকে ডাকাইয়া বলিলেন, দেখুন, জমিদারীর একটা নূতন বিলিব্যবস্থা করতে হবে।

আপনার কি ইচ্ছা জানতে পারলে, আমরা সব ব্যবস্থা করব।

গজাননের ইচ্ছানুসারে রাজপুরে রেখার ধারে একটি প্রকাণ্ড বাঁধাঘাট নির্মিত হইল। নাম 'বিমলাঘাট'। তাহার নিকটেই একটি বড় অতিথিশালা নির্মিত হইল, নাম আরতি-নিবাস। অতিথিশালার দ্বারদেশে আরতি দেবীর মর্মর-মূর্তি স্থাপিত হইল। জমিদারীর অর্ধাংশ গজাননের ভ্রাতুষ্পুত্রকে দান করা হইল। একাংশের আয় হইতে অতিথিশালা এবং গ্রামের বিদ্যালয়টির ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা হইল। একাংশের আয় হইতে বিমলার গ্রামে একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং তাহার বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা হইল। অবশিষ্ট অংশের আয়ে গজানন একাকী কাশীবাসের ব্যবস্থা করিলেন। গজাননের মৃত্যুর পর এই আয় স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের চিকিৎসালয়ে যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা রহিল।

রাজপুর অঞ্চলের লোকে বেদনা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে বিমলা ও আরতির নাম করে। বিমলাঘাটে বসিয়া সিমন্তিনীরা বিমলার কথা

ভাবিয়া কখনও কখনও হয়তো দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলেন। অগণিত নরনারী অতিথিশালায় আতিথ্য লাভ করিয়া মনে মনে আরতিদেবীর আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করে।

৮

ঐ-য্-যাঃ। একি করিয়াছি! মাঝে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম—পিসেমহাশয়ের অসুখের সংবাদ-সহ একখানি চিঠি পিওন দিয়া গেল। তাহাই পড়িতে পড়িতে এবং আদরের পিসিবাড়ীর কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া কি সব লিখিয়া ফেলিয়াছি। পাঠক-পাঠিকাবর্গ ক্ষমা করিবেন। বিমলা ও আরতিদেবী ইহলোকেই আছেন।

কথাটা খুলিয়াই বলিতে হইল।

বিমলার আগমনবার্তা শুনিয়া আরতি দেবী ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করা যায়? একবার ভাবিলেন, এখনই স্বামীকে ডাকিয়া একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলেন। পরক্ষণেই ভাবিলেন, ছিঃ, ইহা লইয়া একটা অসভ্য সীন করা অত্যন্ত অভদ্রতা হইবে। তাছাড়া, নিজে নিঃসন্তান, বিমলা চক্রবর্তী, চক্রবর্তী-হালদার বিবাহও অসম্ভব নয়। না হয় একটা সতীনই হইবে। সতীনের সন্তানদিগকেই না হয় নিজের সন্তান বলিয়া মনে করিবেন। শাস্ত্রে আছে, সর্বনাশে সমুৎপন্নে ইত্যাদি। সুতরাং—

সুতরাং যখন স্নানের ঘরে বিমলার সহিত আরতি দেবীর সাক্ষাৎ হইল, এবং বিমলা আত্মহত্যার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিল, তখন আরতি দেবী তাহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

তাহাতেও ফল হইল না দেখিয়া বলিলেন, বেশ তো, মরণ তো তোমার হাতেই আছে। যখন খুসি মরিতে পারিবে। আজই না হয় নাই মরিলে? বিমলা বলিল, তাহ'লে কাল।

বেশ, তাই—বলিয়া আরতি দেবী বিমলাকে তাহার পূর্বোক্ত শয়নঘরে পৌছাইয়া দিয়া নিজে পিছনের দরজা দিয়া মেয়েমহলে চলিয়া গেলেন।

পরদিন আরতি দেবী এক সুযোগে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তুমি মর্‌বে না কি?

বিমলা ধীরে ধীরে নতশিরে উত্তর দিল, উনি বারণ কর্‌লেন।

তাই তো! উনি যখন বারণ কর্‌লেন, তখন আর মর্‌বে কি করে?

আরো কিছুদিন রাজপুরে থাকিয়া উঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বিমলা অল্প পড়াশুনা জানিত। তাহার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইল। সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থাও হইল। ক্রমশ আরতি দেবীও গানের ক্লাশে যোগ দিলেন।

বৎসর দুই পরে পাড়ার M.A.D. (মেয়ে-অভিনয়-দল) একটি অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। বিমলা ও আরতি দেবী সোৎসাহে যোগ দিলেন।

আরো দুই বৎসর পরে C.A.D. (কলিকাতা-অভিনয়-দল) একটি অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। গজানন কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। গজানন, বিমলা এবং আরতি দেবী, তিনজনেই ভূমিকা গ্রহণ করিলেন।

ক্রমশ ইঁহাদের কলাচর্চা চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাধারণ অভিনয় ছাড়িয়া ইঁহারা ছায়াচিত্রে অভিনয় করিতে আরম্ভ

করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ইঁহাদের খ্যাতি সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল।

বিমলা ও আরতিদেবী অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, রাজপুরের বাঁধা ঘাটে অথবা অতিথিশালায় নয়, সিনেমার রূপোলি পর্দায়!

সেপ্টেম্বর, ১৯৪২